৯২.৬ কমেডি নাটক ঃ বিবর্তন, শ্রেণিবিভাগ, উদাহরণ

গ্রীক 'Komos' (অর্থ : আনন্দোৎসব করা) শব্দ থেকে 'কমেডি' কথাটি এসেছে। অ্যারিস্টটল তাঁর Poetics গ্রন্থের চতুর্থ পরিচ্ছেদে কমেডির কথা প্রথম উল্লেখ করেছেন এবং পঞ্চম পরিচ্ছেদে কমেডির চরিত্র সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন। আদিযুগের কমেডি বলতে ব্যক্তিগত ব্যঙ্গামূলক রচনাকেই বোঝায় এবং তার লক্ষ্য ছিল—ব্যক্তিগতভাবে কাউকে নিন্দামূলক-আক্রমণ করা। কমেডির চরিত্র বলতে সমাজের নিম্নমানের মানুষ। তারা হাস্যকর হতে পারে কিন্তু মন্দলোক নয়। তাদের মধ্যে কোনো বিশ্রীভাব কিংবা কোনো অসম্পূর্ণতা থাকতে পারে, তবে তা দুঃখ-বেদনাদায়ক কিছু নয়। কমেডির কোনো পরম্পরামূলক ইতিহাস নেই বলে অ্যারিস্টটল জানিয়েছেন। কেউ এই সাহিত্য-শাখাটির দিকে সযত্ন ও সে নিষ্ঠ দৃষ্টি নিক্ষেপ করেনি। কমেডির মুখোসের প্রবর্তক কে, এর প্রস্তাবনা প্রথার সূচনাকারী কে কিংবা এর অভিনেতা সংখ্যার বৃদ্ধি ঘটিয়েছেন কে—সে সবই অজানা। তবে সিসিলিতে প্রথম কমেডির উদ্ভব ঘটে।

বর্তমানে কমেডির সম্পূর্ণ বিশেষত্ব দু'টি : তা হবে প্রথমত, হাস্যরসাত্মক। দ্বিতীয়ত, মিলনাত্মক। কিন্তু বিরহ বা মৃত্যু মানেই যেমন ট্র্যাজেডি নয়, মিলনমাত্রই তেমনি কমেডি নয়। ট্র্যাজেডির মতো কমেডিরও একটি নিজস্ব দর্শন আছে। হাসিরও আছে নানা মাত্রাভেদ। বস্তুত, সমাজের নানা প্রয়োজন-প্রকৃতি-অবস্থা বিশেষত্ব, নায়ক-নায়িকার মিলনের প্রকার-বৈশিষ্ট্য-ব্যাপকতা, হাসির নানা প্রকারভেদ ও মাত্রাভেদ,—ইত্যাদির বিভিন্ন দিক বিচার পর্যবেক্ষণ করে তবেই কমেডির সংজ্ঞা নিরূপণ করা যেতে পারে। এই সব নানা বৈচিত্র্য ও বিভিন্নতার কারণের ফলেই কমেডির নানা শ্রেণীবিভাজন এসে গেছে। কাজেই কমেডির স্বরূপ-লক্ষণ নির্দেশকালে এই তিনটি দিক প্রধানত বিচার্য : (ক) সমাজ, প্রতিবেশ ও সমাজের বিশেষত্ব, (খ) নায়ক-নায়িকার মিলনের মূল স্বরূপ, (গ) হাসির প্রকারভেদ ও মাত্রাভেদ। অবশ্য এক্ষেত্রে বিশেষভাবে লক্ষণীয়, উচ্চস্তরের বিশুদ্ধ কমেডি কোনো বিশেষ দেশ-কাল-সমাজের রীতি-নীতি-সংস্কারের দ্বারা সীমাবদ্ধ নয়। ব্রাহ্মসমাজ ও স্ত্রীশিক্ষাকে ব্যঙ্গ করে অমৃতলাল যে 'খাসদখল' কমেডি নাটক রচনা করেছিলেন, আজ তার সামাজিক প্রতিবেশ লুপ্ত। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের 'বৈকুণ্ঠের খাতা' আজও সমানভাবে আদৃত।

এইখানে কমেডির সঙ্গে প্রহসনের কথা অপরিহার্য রূপে উঠে পড়ে, বিশেষত আমাদের দেশে। প্রহসন ও কমেডি দুই ভিন্ন সাহিত্য-শাখার নিদর্শন, তথাপি আমাদের দেশের মতো অন্যান্য অনেক দেশে এ-দুই সাহিত্যশাখার মিশ্রণ ঘটে গেছে। কমেডিকে এজন্যে উচ্চ ও নিম্ন—এই দুইভাগে বিভক্ত করে, প্রহসনকে নিম্নমানের কাছাকাছি সাহিত্যের নিদর্শন বলা হয়। কিন্তু বিশেষভাবে ভেবে দেখলে কমেডি এবং প্রহসনকে সহজেই ভিন্ন করে দেখা যায়। কমেডি এক নিয়মিত নাট্যশাখা, তার প্লট, চরিত্র, চরিত্রের বিবর্তন (এবং এমনকি দ্বন্দ্বও) সাধারণ নাটকের মতোই। আকারের দিক থেকে তা দীর্ঘায়তও হতে পারে। কিন্তু প্রহসনে নিয়মিত নাটকের নিয়মানুসারণের প্রয়োজন নেই, চরিত্রের ক্ষেত্রেও তাই-ই। বিষয় প্রসঙ্গত আপেক্ষিকভাবে তুচ্ছ। এখানে 'প্রকৃষ্টরূপে হসন টাই বড়ো, কিন্তু সেই হাসির সূক্ষ্মতা ও মাত্রাভেদের প্রসঙ্গটি ততো বড়ো নয়। 'পঞ্চভূত' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ যখন বলেছিলেন, কমেডিই উচ্চস্তরে উপনীত হয়ে ট্র্যাজেডিতে রূপ নেয়, তখন তিনি কমেডির বিশুদ্ধ খাঁটি ও উচ্চস্তরের রূপটিকেই মনে রেখেছিলেন, — কোনো প্রহসন জাতীয় নিম্নমানের কমেডিকে নয়। তবে, প্রহসনের সঙ্গে সমাজের চলমান প্রতিবেশ ও অবস্থা-বিপর্যয়ের যে গভীর যোগ আছে, কমেডির সঙ্গে সেই যোগ আরো সূক্ষ্ম, পরিমাণেও উচ্চস্তরের। রবীন্দ্রনাথের উক্তিকেই অবলম্বন করে বলা যায়, সমাজ ও সামাজিক বিপর্যয় যখন স্থূল ও প্রত্যক্ষরূপে প্রদর্শিত হয়, তখন তা প্রহসন। তাকেই উচ্চ ও সূক্ষ্ম করলে তা কমেডির প্রেক্ষাপট হয়।

সমাজ-প্রতিবেশের পরেই কমেডির দ্বিতীয় মুখ্য বৈশিষ্ট্য হল—নায়ক-নায়িকার মিলন-প্রসঙ্গ। এই মিলন-প্রসঙ্গ ধরেই আসে প্রেমের কথা। প্রেম ও রোমান্স বিশ্বের কমেডি নাটকের একটি প্রধান দিক, সব বড়ো কমেডিকারই প্রেমকে একটি প্রধান উপকরণরূপে গ্রহণ করেছেন। তবে, কমেডির প্রেমকে কোনো লঘু-কৌতুকময় দৃষ্টিতে দেখা হয় না। প্রহসনের প্রেমের সঙ্গে কমেডির প্রেম-চিন্তার-পার্থক্য এখানেই। প্রেমকে এখানে নিতে হবে গভীর-গম্ভীর দৃষ্টিতে। দ্বিতীয়ত, নায়ক-নায়িকার নিছক মিলনই এখানে বড়ো কথা নয়। অপর কোনো প্রেমিক-প্রেমিকার সঙ্গে বিরহ বা বিচ্ছেদ ঘটিয়ে মিলন নয়। কিংবা, নাটকের অন্য কোনো পাত্র-পাত্রীর জীবনে ও মনে কোনো প্রকার দুঃখ-যন্ত্রণার সৃষ্টি করে মিলন নয়। এ-মিলন হবে সর্বাত্মক—সকল পাত্র-পাত্রীর কাছেই সমান সুখদায়ক, এমনকী, যে প্রেমিক বা প্রেমিকা নয়, তার পক্ষেও।

তৃতীয়ত, হাস্যরসের দিক। কমেডির হাসিকে বলা হয় Humour, বাংলায় বলা যায়—পরিহাসের হাসি। এ-হাসির মধ্যে এক ধরনের জীবনরস রসিকতা আছে। কেউ-কেউ বলেছেন, এ-হাসি একদিকে চিন্তার খোরাক জোগাবে আর অন্যদিকে তা প্রমোদমূলক হবে। রবীন্দ্রনাথ হাসির মধ্যে চিন্তার খোরাক এবং প্রমোদের আয়োজনকে না দেখে অন্যদিকের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তাঁর মতে হাস্যরসের মূল উৎস Incongruity বা অসঙ্গতি, অবশ্য অসঙ্গতি নানা প্রকারের হতে পারে : চিন্তার সঙ্গে কর্মের, প্রত্যাশার সঙ্গে প্রতিফলের। দ্বিতীয়ত, সেই হাসিই শ্রেষ্ঠ হাসি, যা অশ্রুর আসঙ্গযুক্ত। ফাল্গুনের পূর্ণিমা আর শ্রাবণের পূর্ণিমার তুলনা করে তিনি শ্রাবণের পূর্ণিমার হাসিকে শ্রেয়োতর বলেছেন; কারণ, সেখানে হাসির সঙ্গে আছে শ্রাবণের বর্ষণ। এই অর্থে পাশ্চাত্যের 'হিউমার' এবং রবীন্দ্রনাথের হাসি-অশ্রুর সম্মিলন অভিন্ন। পাশ্চাত্য হাস্যরসিক যখন কমেডির হাসির মধ্যে 'চিন্তার খোরাক'কে দেখেন, তখন তিনিও এক বিশেষ 'দর্শনে'র কথা বলেন ঃ বাহ্যত কথাটি বিরুদ্ধতামূলক, কিন্তু মূল কথা হল, বহিরঙ্গে যা হাসির বিষয়, অন্তরঙ্গ চিন্তায় তাকেই মনে হয়,—জগৎ ও জীবন সম্পর্কে এক গভীর দিক তাতে নিহিত আছে। কাজেই কমেডির অন্তর্নিহিত হাসিকে গ্রহণ করতে হবে এক জীবনসত্যরূপে। হাসির নানা মাত্রা ও প্রকারভেদ আছে। বিশুদ্ধ কমেডিতে আমরা হিউমারের প্রকাশ দেখি। আবার কোনো-কোনো অন্য ধরনের কমেডিতে Wit বা বুদ্ধিদীপ্ত হাসির প্রকাশও দেখি। হাসির প্রকার ও মাত্রাভেদ অনুসারে কমেডির মধ্যেও শ্রেণিভেদ এসে গেছে।

কমেডির স্বরূপ সম্পর্কে শেষ কথা হলো, কমেডি নাটক দর্শকের মনের মধ্যে সৃষ্টি করবে এক প্রসন্ন ও মনোরম অনুভূতির। এই মানসিক দিকটিই কমেডির শেষ ফল। কমেডি মানে জীবনের লঘু-কৌতুকতার দিক নয়, কমেডি নাটকও কোনো তুচ্ছ শ্রেণির সাহিত্যসামগ্রী নয়। উচ্চস্তরের কমেডি মানুষকে মানুষের জীবন সম্পর্কে ভাবায়। যেমন উচ্চস্তরের ট্র্যাজেডি মানুষকে তার জীবন উপলব্ধি করায়। এই 'ভাবানো' ও 'উপলব্ধি করানো'—দুইই জীবনের দুই দৃষ্টিকোণ। রবীন্দ্রনাথ কমেডি ও ট্র্যাজেডির মধ্যে কোনো প্রকারগত (Kind) বিভেদ স্বীকার করেন নি। তাঁর মতে, এ দুয়ের মধ্যে যে ভেদ, তা মাত্রাগত (Degree)। তাই কখনো গানে বলেন, "বিরহ মধুর হল আজি মধুরাতে', কখনো বলেন—"ওগো অকরুণ কী মায়া জানো—মিলন ছলে বিরহ আনো।" মিলনের মধ্যে বিরহকে এবং বিরহের মধ্যে আনন্দকে তিনি অনুভব করেন।

যুগে যুগে কমেডির আকার ও প্রকারগত নানা বিবর্তন ও পরিবর্তন ঘটেছে। কমেডির বিষয়বস্তু ও প্লটেরও পরিবর্তন হয়েছে। ফলে কমেডির নানা শ্রেণিভেদ এসে গেছে।

এথেন্সে যে গ্রিক কমেডির সূত্রপাত ঘটে ট্র্যাজেডি নাটকের পাশাপাশি, তা একটি বিশেষ নাট্যধারা রূপেই স্বীকৃতি লাভ করে। এগুলিতে থাকত লঘু আমুদে চরিত্র, সুখে ও মিলনে নাটক সমাপ্ত হতো। গ্রিক কমেডির আদিযুগের বৈশিষ্ট্য ছিল,—কোন ব্যক্তিকেন্দ্রিক ব্যঙ্গ-বিদ্রুপাত্মক বিষয়। প্রখ্যাত ব্যক্তিগণের দোষ-নির্বুদ্ধিতাকে নিয়ে গড়ে উঠত এসব কমেডির কাহিনী। আরিস্তোফেনেস ছিলেন এই যুগের প্রধান

কমেডিকার। পরবর্তী যুগের কমেডির বিষয় হয়, সামাজিক রীতি-নীতি প্রথা এবং সামাজিক জীবন প্রতিবেশ,—মূল রচনা হারিয়ে গেছে, লাতিন ভাষার মাধ্যমে কিছু মেলে। গ্রিক কমেডির তৃতীয় বা নব্য কমেডির যুগে যে সব কমেডি নাটক মেলে, তার বিষয়-চিন্তা বা ভাবনা উদ্রেককারী হাসি। এরও নিদর্শন আজ অবলুপ্ত। তবে পরবর্তী যুগের বিভিন্ন কমেডিকারদের ওপর তাঁদের প্রভাব অন্বেষণ করা যায়। প্রাচীন গ্রিসে ট্র্যাজেডির যতখানি উন্নয়ন ঘটে, কমেডির উন্নতি সে তুলনায় কিছুই নয়। কমেডি বলতে তখন মূলত ব্যঙ্গবিদ্রূপ মুলক রচনাকে বোঝাত এবং তা ছিল এক প্রকার Burelesque' (= ইতালীয় Burlesco থেকে Furla, অর্থ হল—উপহাস-হাসি-ঠাট্টা)।

গ্রিক যুগের পর রোমান যুগ। গ্রিক কমেডির নব্যযুগের দ্বারা ইতালীয় কমেডি লেখকরা অনুপ্রণিত হন। এঁদের অনেকেরেই রচনা অবলুপ্ত। তবে লাতিন নাট্যকার প্লতাস এবং তেরেন্স-এর কিছু রচনা পাওয়া গেছে। কৌতুক এবং অপ্রতিরোধ্য হাসি এঁদের কমেডির বিশেষত্ব, যদিও এসব কমেডি ছিল প্রহসনমূলক। এঁদের কমেডি সম্পর্কে চিন্তা ও কমিক পরিস্থিতির সম্পর্কীয় ধারণা পরবর্তীকালের কমেডি ধারায় প্রভাব ফেলেছে।

এরপর প্রবর্তিত হয় ইংরেজি কমেডি নাটকের প্রাথমিক যুগ ও তার পরে আসে এলিজাবেথীয় রোমান্টিক কমেডির যুগ। বাইবেলীয় ধর্মভাবনা এবং সাধু-সন্তদের অলৌকিক কর্মাবলীকে কেন্দ্র করে প্রাথমিক যুগে ইংরেজি কমেডির সূচনা হয়। এসব ধরনের রচনা আর একটু বিবর্ধিত হয়ে 'Interlude'–এ (নাটকের দুই দৃশ্য বা অঙ্কের মধ্যবর্তী অংশে অভিনেয় ; অনেকটা সংস্কৃত নাটকের 'বিষ্কম্ভক'-এর মতো)রূপ নেয়। খাঁটি অর্থে ইংরেজি কমেডির সূচনা হয় Renaissance-এর পরবর্তী যুগে লাতিন লেখকদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে। প্রাথমিক যুগের ইংরেজি কমেডি নাটকের চরিত্র বলতে সাধারণ মানুষ এবং বিষয় বাস্তব জীবনকেন্দ্রিক। হাস্যরসাত্মক পরিস্থিতির উদ্ভাবন ও প্রয়োগ ছিল এর সাহিত্যিক কৌশল। সঙ্গে ছিল কৌতুকাবহ চরিত্র। কৌতুকরস এবং আমোদ পরিবেশন ছিল এই ধরনের কমেডির লক্ষ্য।

শেকস্‌পীয়ারারের নাটককে অবলম্বন করেই রোমান্টিক কমেডির শ্রেষ্ঠ যুগ চিহ্নিত হয়েছে। কমেডি তখন আর কেবল কৌতুকপূর্ণ প্রহসনধর্মী বা হাস্যরসাত্মক কিছুর অনুকৃতি মাত্র হয়ে থাকল না। প্লটের নির্মাণ-কৌশলে, চরিত্রের চিত্রণে, রোমন্টিক বাতাবরণ সৃষ্টিতে তা এক নাট্যশিল্প হয়ে উঠল। সংলাপও হল নাট্যধর্মী। শেকস্‌পীয়ারের 'As You like It', 'A Midsummer Night's Dream', 'Twelfth Night', 'Much Ado About Nothing'–প্রভৃতি কমেডি নাটকের নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য। এইসব নাটকে প্রেম ও রোমান্স একটি বড়ো উপকরণ। এই রোমান্টিক কমেডিগুলিতে প্রেমের যে উচ্চ এবং সূক্ষ্ম রূপ প্রতিফলিত হয়েছে, তার ফলে এই ধরনের কমেডিগুলিকে 'High Comedy' নামে চিহ্নিত করা হয়েছে। যাকে বলে ভাবনাদ্যোতক বা চিন্তামূলক হাসি, এ কমেডিগুলির হাস্যরসও ছিল তাই। শেকস্‌পীয়ার ছাড়াও এলিজাবেথীয় যুগের অন্যান্য ইংরেজ নাট্যকারগণও 'High Comedy' রচনা করেছেন।

রোমান্টিক কমেডিরই এক ধারা যেমন High Comedy, তেমনি তার অপর ধারা হল—ট্র্যাজি-কমেডি। নাম থেকেই বোঝা যাচ্ছে, এর মধ্যে ট্র্যাজেডির ভাব-গম্ভীরতার সঙ্গে কমেডির আনন্দদায়ক মনোরম দিকের মিশ্রণ ঘটেছে। নাটকের পরিসমাপ্তিতে নায়ক-নায়িকার মিলন হয় বটে, কিন্তু নাটকটির ভাবপরিমণ্ডলে একটি গাম্ভীর্যময় বিষাদের আভাস ছড়িয়ে থাকে। অবশ্য এই দুই বিপরীত ভাবের মিশ্রণ সহজসাধ্য ব্যাপার নয়, অনেকের পক্ষেই তা অসাধ্য থেকে গেছে। ট্র্যাজি-কমেডি নাটকের সফল দৃষ্টান্তরূপে শেকস্‌পীয়ারের 'The Merchant of Venice', 'Measure For Measure' প্রভৃতি নাটকের নাম সমগ্র বিশ্বেই পরিচিত। 'The Merchant of Venice' নাটকে নায়ক-নায়িকাগণের মিলন হল বটে, কিন্তু শাইলক পেল না কিছুই, নিঃসঙ্গ হয়ে সে বিদায় নিয়েছে। ফলে মিলনের মধ্যেও কোথাও যেন বিষাদের এক গভীর সুর বেজে উঠেছে।

ট্র্যাজি-কমেডির ধারা ফ্রান্সের বিখ্যাত নাট্যকারগণ—মলিয়ের এবং কর্নেঈ-এর প্রয়াসে এক নতুন কমেডি নাটকের ধারার সৃষ্টি করে, তাকে বলা হয়েছে—'Heroic Comedy'। এই কমেডির কেন্দ্রে থাকেন একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তি, তাঁরই 'সিরিয়াস' এবং গভীরতাপূর্ণ কথা-কর্মের সঙ্গে প্রহসনধর্মী লঘু-তরলতা যুক্ত করে এ ধরনের কমেডি নাটক রচিত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে রোমান্টিক কমেডিরই প্রশাখা হল—ট্র্যাজি-কমেডি এবং হিরোইক কমেডি।

সামাজিক প্রতিবেশ ও অবস্থাকে অবলম্বন করে কমেডির নানা শ্রেণিবিভেদ দেখা দেয়। ইংলণ্ডে রোমান্টিক কমেডির প্রতিক্রিয়ায় বেন জনসন প্রবর্তন করলেন Comedy of Humour। বাস্তব সমাজজীবন ছিল তার উৎস। যে মানুষের কথা-কর্মের সঙ্গে তার মূল ব্যক্তিত্ব সামঞ্জস্যমূলক নয়, সেই অসঙ্গতির মধ্যেই এ ধরনের কমেডির হাস্যরস নিহিত থাকত। অসঙ্গতিজাত হিউমারই লক্ষ্য বলে এদের বলা হত Comedy of Humour। সামাজিক দিক থেকে বিচার করলে এই ধারার কমেডি নাটককে রোমান্টিক কমেডি ধারার বিপরীতে স্থাপনা করা যায়।

Comedy of Humour-এর পাশাপাশি, সমান্তরাল ধারায় ফ্রান্সে আবির্ভূত হল Comedy of Manners। সমকালীন সামাজিক রীতি-নীতি প্রথাকে ব্যঙ্গ-উপহাস করাই এই ধারার কমেডির লক্ষ্য যথা উদ্দেশ্য ছিল। সামাজিক ব্যবস্থায় মানুষ যে-নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দেয়, এই ধরনের কমেডিতে তারই মাধ্যমে হাস্যরস সৃষ্টি করা হয়। এই গোত্রীয় কমেডি সামাজিক দিক থেকে বাস্তব। মলিয়ের এই বিষয়ে বিশ্ববিখ্যাত দৃষ্টান্ত হয়ে আছেন। ইংলণ্ডেও পিউরিটান যুগের শেষে Restoration পর্বে (১৬৬০-১৭০০ খ্রিঃ—এই পর্বটিকে ফরাসি সাহিত্যের প্রভাবের পর্ব বলা হয়) Congreve প্রভৃতি প্রতিভাবান কমেডিকারগণের দ্বারা Comedy of Manners-এর ব্যাপক প্রচলন দেখা দেয়। Conedy of Humdur এর মতো Comedy of Manners ও সমকালীন সমাজ ও সামাজিক জীবনের প্রতিবেশ থেকে উৎসারিত। তবে সমাজ বলতে তখনকার ইংলণ্ডের অভিজাত সমাজ এবং সেই সমাজের রীতি-প্রথা ও তার অনুভূতিকে ব্যঙ্গ-উপহাস করাই এসব কমেডি নাটকের মূল লক্ষ্য।

Comedy of Manners-এর মধ্যে যে প্রাণপ্রাচুর্য ও আনন্দোল্লাসের দিকটি ছিল, অতঃপর তার অবক্ষয় ঘটে। তখন যে কমেডি ধারাটির উদ্ভব হল, তা Sentimental Comedy নামে পরিচিত। অর্থহীন ভাবাবেগ সর্বস্বতা এবং নিষ্প্রাণ আবেগ ছিল এই ধারার কমেডির প্রধান বিশেষত্ব। দ্বিতীয় ও মধ্যমশ্রেণির নাট্যকারগণ তার রূপদানকারী। জীবন এবং সামাজিক জীবনের প্রতিফলনের মধ্যে ছিল না জীবনের উষ্মা আবেগ—এসে পড়েছিল অতিরঞ্জন প্রবণতা ও কৃত্রিমতা। কিন্তু শীঘ্রই শেরিডান এবং গোল্ডস্মিথ এর মতো কমেডিকারদের আবির্ভাব ঘটল। তাঁদের কমেডি প্রাণপ্রাচুর্যময়, নাম হল—Anti Sentimental Comedy। কৌতুক, নির্বুদ্ধিতা এবং প্রহসনের সংমিশ্রণে এক অভিনব নাট্যধার প্রবর্তন ঘটল। শেরিডানের The Rivals এবং গোল্ড্স্মিথ-এর She Stoops to Conquer নাটকগুলি এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

আধুনিক কমেডির সূচনা হয়েছে 'Shavian' নাট্যধারা থেকে, জর্জ বার্নার্ড শ্য যার পুরোধা। এর মধ্যে হাসিও আছে, চিন্তার খোরাকও আছে। একই সঙ্গে আছে শিক্ষা ও আনন্দেরদিক। সেজন্যে এই ধারার নাটককে বলা হয়েছে 'উদ্দেশ্যমূলক কমেডি' (Purpose Comedy)। কমেডির পরিবেশ এখানে অনেকটাই ভাবগম্ভীর, হাসিও চিন্তার উদ্রেককারী, ট্র্যাজেডি-কমেডির কঠোর প্রাচীর এখানে উন্মুক্ত। বার্নার্ড শ্য নিজেই নিজেকে 'a classic writer of comedies' বলেছেন। কমেডির মধ্যে তাঁর উদ্দেশ্য হল, 'to chasten morals with ridicule', ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ-উপহাসের মাধ্যমে নৈতিক উপদেশ দান ও সমাজ শোধন করা । মানুষ ও মানুষের সামাজিক জীবনের নানা সমস্যা তাঁর নাটকের আলোচ্য বিষয়। Action-এর চেয়ে সংলাপ তাঁর নাটকের মূল উপকরণ এবং এই সংলাপই তাঁর নাটকের ঐশ্বর্য। চরিত্রগুলি কৌতুহলোদ্দীপক। অনেক সময়েই তাঁর নিজ বক্তব্যের প্রচারক। রাজনীতি, অর্থনীতি, ধর্মনীতি সম্বন্ধে

অনেকেই সচেতন নন, কমেডির তীক্ষ্ম সংলাপের মাধ্যমে মানুষকে সচেতন করাই, তাঁর মতে কমেডির লক্ষ্য। তাঁর 'Man and Superman' নাটককে তিনি একই সঙ্গে কমেডি এবং 'দর্শন' বলেছেন। Arms and The Man', 'Pygmallion' 'Candida' প্রভৃতি তাঁর সর্বজন পরিচিত কমেডি নাটক।'

পণ্ডিতজনেরা কমেডির শ্রেণিবিভাগ অন্যভাবেও করেছেন। যেমন—Genteel Comedy এবং Comedy of Intrigue। Genteel কথাটির অর্থ হল, ভদ্র-শোভন-আদবকায়দা দোরস্ত লোক,. এর সঙ্গে ভাবগত সাদৃশ্য আছে Sentimental Comedy-র। Intrigue কথাটির অর্থ—ষড়যন্ত্র, গুপ্ত চক্রান্ত। নাটকের প্লটের মধ্যে যেখানে একটি বিশেষ ষড়যন্ত্র থাকে। এর সঙ্গে তুলনীয় হল—Anti Sentimental Comedy, Comedy of Humour এবং Comedy of Manners। এই শেষোক্ত ধরনের কমেডিগুলিকে বাস্তবজীবন ঘটিত কমেডি বলা যেতে পারে।

একাংক নাটক রূপেও কমেডি নাটক রচিত হয়েছে। অনেক নাট্যকারই এ বিষয়ে সফল হয়েছেন।

এইবারে কয়েকটি বাংলা কমেডি নাটকের উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। বাংলা কমেডির উদাহরণ প্রসঙ্গে দু'টি কথা মনে রাখা বিশেষ প্রয়োজন ঃ এখানে কমেডি-প্রহসন মিলে-মিশে গেছে, লেখক সমালোচকেরাও এ দু'টিকে কোনো-কোনো ক্ষেত্রে মিশিয়ে ফেলেছেন। দ্বিতীয়ত, সংস্কৃত নাটকের কমেডির ধারা প্রথম যুগের কমেডিকারদের বিশেষত প্রভাবিত করেছে।

যেমন মাইকেলের 'শর্মিষ্ঠা' নাটক। শর্মিষ্ঠা-যযাতি-দেবযানী মিলে যে একটি ক্রিকোণ প্রেমের সমস্যা দেখা দিয়েছিল, তা একটি খাঁটি কমেডির সৃষ্টি করতে পারত। মাইকেল প্রাচীন ভারতীয় রীতির অনুসরণে (যেহেতু কাহিনী মহাভারত থেকে নেওয়া) শর্মিষ্ঠা-দেবযানীর সঙ্গে যযাতির মিলনসাধন করে কমেডি লিখেছেন। কমেডির হাস্যরসের দিকটিকে বিদূষকের দ্বারা পূরণ করা হয়েছে। দীনবন্ধু মিত্রের 'লীলাবতী'তে নায়ক-নায়িকার চরিত্রের পারিবারিক পরিচয়ের রহস্য একটি ভালো কমিক উপকরণে পরিণত হতে পারত। পুরুষের স্ত্রী-সাজা এবং কমেডি নাটকের বিশেষ পরিস্থিতি নির্মাণ শেকস্‌পীয়ার থেকে রবীন্দ্রনাথের নাটক পর্যন্ত সর্বত্রই দেখা যায়, কিন্তু 'লীলাবতী'তে দীনবন্ধু এটিকে আরো নাটকীয় করে তুলতে পারতেন। কোনো-কোনো বিশেষ ধরনের কমেডিতে যে সমকালীন সমাজ পরিস্থিতি একটি প্রধান দিক হয়ে ওঠে, 'লীলাবতী'তে তা নিদর্শনও (যথা—কৌলীন্য প্রথা, ব্রাহ্মসমাজের ভূমিকা, স্ত্রীশিক্ষা) মেলে।

অমৃতলাল বসুর 'খাসদখল' একটি ভালো কমেডি নাটক, যদিও কেউ কেউ এটিকে প্রহসনও বলেন। কোনো-কোনো সমালোচক ইংরেজি Comedy of Romance-এর নিদর্শন এর মধ্যে পেলেও আসলে এটি Comedy of Manners। ব্রাহ্মসমাজের দ্বারা স্ত্রীশিক্ষার প্রবর্তন, বিধবার পুনর্বিবাহ ইত্যাদি সমকালীন সামাজিক প্রসঙ্গ এতে স্থান পেয়েছে,—যদিও এখানে রোমান্টিক উপকাহিনীও আছে। শেষ দৃশ্যে মূলকাহিনী এবং উপকাহিনী—দুই কাহিনীরই নায়ক-নায়িকার মিলন ঘটেছে। ষড়যন্ত্র ও Intrigue এটির মধ্যে প্রাধান্য পেয়েছে। চিকিৎসকদের প্রতি কিছু আক্রমণাত্মক মন্তব্যও আছে।

আধুনিক নাট্যকারদের মধ্যে বিধায়ক ভট্টাচার্যের 'তাইতো' একটি সুন্দর কমেডি। মিলন এবং হাস্যরস—কমেডির দুই প্রধান উপকরণের শিল্পসম্মত প্রয়োগ নাট্যকার প্রদর্শন করেছেন। নাট্যকারের নিজের মন্তব্য অনুসারে—সমস্যাময় জীবনের মধ্যে তিনি মানুষকে কিছু আনন্দদান করতে চান। নাটকটির সংলাপের বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

৯২.৭ প্রহসন নাটক ঃ বিবর্তন, শ্রেণিবিভাগ, উদাহরণ

ইংরেজিতে যাকে বলে Farce, বাংলায় তাকেই বলা হয় প্রহসন। ভারতীয় নাট্যসাহিত্যে প্রহসনের একটি বিশিষ্ট ইতিহাস ও ঐতিহ্য আছে, যেমন ইংরেজি Farce-এর। ইংরেজি Farce যে ভারতীয়

প্রহসনের প্রতিশব্দ, একথা সম্ভবত প্রথম বলেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত, তাঁর পত্রাবলীতে। 'একেই কি বলে সভ্যতা?' রচনাটির আখ্যাপত্রে তিনি 'প্রহসন' অভিধাটির ব্যবহার করেছেন।

কারো-কারোর অনুমান, সম্ভবত ফ্রান্সেই Farce-এর উদ্ভব হয়। তার একটি কারণ, লাতিন 'Faracire' (= to staff) শব্দটি ফরাসি ভাষায় Farce রূপেই প্রচলিত হয়। গ্রাম্য লাতিন ভাষায় বলা হত 'Farsa'। প্রাথমিক স্তরে Farce ছিল এক ধরনের প্রস্তুতিবিহীন নাটক। গুরুগম্ভীর বা অন্য যে কোনো নাটকের বিভিন্ন দৃশ্যের ফাঁকে-ফাঁকে যা staff করে দেওয়া বা ভরে দেওয়া হতো। ফলে পরবর্তীকালে হৈ-চৈ গণ্ডগোল পূর্ণ উদ্দামতাময় Comic Action রূপে এগুলির বিবর্তন ঘটে। Farce এর মূল লক্ষ্য ছিল, বাহ্যিক দৃশ্য-ঘটনা দ্বারা মানুষকে হাসানো। কোনো পরোক্ষ ভাবে নয়,—খাঁটি কমেডিতে যা হয়ে থাকে। হাসির মাত্রাভেদের দিক থেকে এখানেই প্রহসন ও কমেডির মধ্যে মূল পার্থক্য। প্রহসনের মধ্যে থাকে আকস্মিকভাবে কোনো কিছুর আবির্ভাব বা উপস্থিতি, দৈহিক অঙ্গাভঙ্গি, পুনরাবৃত্তি, চরিত্রগত অতিশোয়োক্তি। এর জগৎ সম্ভব-অসম্ভবের এক মিশ্র জগৎ। ফরাসি নাট্যকার মলিয়ের নানাভাবে এই প্রাথমিক ও সম্পূর্ণ নাট্যধারাটির উন্নতিসাধন করেন। নানা অভিঘাতের মধ্য দিয়ে ধারাটি বেঁচে থাকে এবং ইউরোপের বিভিন্ন দেশে সেটি ছড়িয়ে পড়ে।

ষোড়শ শতাব্দীতে ইংলণ্ডের নাটকের মধ্যে একটি মিশ্র ধারার প্রবর্তন ঘটল, প্রহসনের ধারাটি তার মধ্যে একটি বড় দিক। এর বৈশিষ্ট্য হলো কোনো গুরুগম্ভীর বিষয়ের নাটকের মধ্যে কিংবা অন্য যে কোনো বিষয়ের নাটকের বিভিন্ন দৃশ্যের ফাঁকে ফাঁকে কোনো 'Farcial Episode' অনুপ্রবিষ্ট করিয়ে দেওয়া। শেকস্‌পীয়ারের বিভিন্ন কমেডি নাটকে (যথা : 'Comedy of Errors', A Midsummer Night's Dream'. The Twelfth Night' প্রভৃতি নাটকে। এই Episode বা খণ্ডকাহিনীগুলিকে বলা হতো Burlesque,—যার পরিচয় লিখেই দেওয়া হয়েছে) এগুলির প্রয়োগ দেখা যায়। ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাসে Commonwealth Period-এ প্রহসন একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ নাট্যধারা হয়ে উঠলেও অষ্টাদশ শতকের প্রথম দিক থেকেই প্রহসন অন্য কোনো নাটকের শেষে অভিনীত হতে থাকে Afterpiece রূপে। After-piece রূপে প্রহসন নাটকের চাহিদা বেড়ে যেতেই ইংরেজি নাট্যধারায় এর নিজস্ব বিশিষ্ট প্রয়োগ প্রচলিত হল,—রচনা রীতিতেও পরিবর্তন এল। সেজন্য Sentimental Comedy, Melodrama প্রভৃতির সঙ্গে প্রহসনের মিশ্রণ ঘটে গেল। Farce বা প্রহসনের রচনানীতির মধ্যে Parody, Burlesque, Travesty (কোনো কিছুর হাস্যকর অনুকরণ করা) প্রভৃতির প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। তিনটির সঙ্গেই ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের সংযোগ আছে, প্রহসনেও তা আছে।

পাশ্চাত্য প্রহসনের উদ্ভব ও রচনাগত বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে দেশের সামাজিক অবস্থা বিপর্যয়ের সংযোগের কথা বিশেষভাবে বলা হয়ে থাকে। "প্রহসন-সামাজিক উপপ্লবের ও অশান্তির নির্দেশক।" অর্থাৎ যখনই কোনো দেশে বা সমাজে কোনো বিরুদ্ধ-বিরূপ রীতি-নীতির অনুসরণ দেখা যায়, তখনই তার প্রতিক্রিয়ায় সে দেশে প্রহসন ও Farce রচিত হয়। সমাজের এই বিপর্যয়ের কথাটি মনে রেখেই প্রহসনের প্রসঙ্গে Comedy of Manners-এর কথাটি উঠে পড়ে। ১৬৫৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে মলিয়ার এই ধারাটির প্রবর্তন করতে শুরু করেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মলিয়ারের 'The Cit Turned Gentleman'-এবং 'Marriage Force', এ দুটি প্রহসনের বঙ্গানুবাদ করেছিলেন, যথাক্রমে 'হঠাৎ নবাব' এবং 'দায়ে প'ড়ে দারগ্রহ ' নামে।

প্রাচীন ভারতীয় নাট্যধারার অন্তর্গত প্রহসনের কথাও এখানে বলা প্রয়োজন। দীর্ঘায়ত সংস্কৃত নাটকের সমান্তরাল ধারায় হাস্যোদ্রেকের জন্য এক ধরনের স্বল্পায়তন নাটকের কথা সংস্কৃত আলংকারিকেরা বলেছেন, যার নাম প্রহসন। বিশ্বনাথ কবিরাজ তাঁর 'সাহিত্যদর্শন' গ্রন্থের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে প্রহসন সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। তিনি বলেন, প্রহসন হবে একটি অঙ্কে প্রসারিত, কখনো বা দুই অঙ্কের।

হাস্যরস হবে তার মুখ্যরস, আখ্যানবৃত্তটি হবে কোনো নিন্দার্হ ব্যক্তিকে নিয়ে। নাটকে যদি একটি মাত্র ধৃষ্ট চরিত্র থাকে তবে তা হবে 'শুদ্ধ' স্তরের। আর যদি একাধিক ধৃষ্ট চরিত্র থাকে, তবে তা 'সংকীর্ণ' স্তরের প্রহসন। তবে, নায়ক চরিত্র হবে একজন তপস্বী বা বিপ্র। সংস্কৃত প্রহসনের দৃষ্টান্তরূপে 'কৌতুকসর্বস্ব', হাঁস্যার্ণব প্রভৃতির নাম করা যায়।

সংস্কৃত প্রহসনগুলির ধৃষ্ট বা নিন্দনীয় চরিত্রগুলি হতো নাট্যকারের কল্পিত। বাংলা প্রহসনগুলির মধ্যে বাস্তবতা এবং এমনকি কোনো-কোনো ক্ষেত্রে প্রকৃত বিষয়ই গৃহীত হতো। প্রহসনের ধারাটিকেই আশ্রয় করে বাংলা সাহিত্যে বাস্তবতার প্রাথমিক বিকাশ ঘটে। হাস্যরসাত্মক চরিত্র পরিস্থিতি-খণ্ডকাহিনী-নক্শাধর্মী আখ্যান সৃষ্টি করে সমাজ-শোধনের প্রয়াস বাংলা প্রহসনের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য। সমাজ-শোধন বিশ্বের অন্যান দেশের প্রহসনেরও উদ্দেশ্য। প্রহসনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের বিবর্তনটি এই রকমের : প্রথমে ব্যক্তিগতভাবে কোনো চরিত্রকে ব্যঙ্গ-উপহাস, তারপর নিছক ও আমোদমূলক হাস্যরসের যোগান দেওয়া, শেষে হাস্য-ব্যঙ্গের মাধ্যমে সমাজ-শোধন করা। বাংলায় প্রহসনের নানা প্রতিশব্দ মেলে : 'সমাজচিত্র', 'সামাজিক নক্শা', 'পঞ্চরং'। সুকুমার সেন 'পঞ্চরং'-এর ব্যাখ্যা দিয়েছেন এই বলে : 'বিদ্রূপাত্মক প্রহসন'। কাজেই প্রহসনের উদ্দেশ্য—কখনো বিদ্রূপ প্রকাশ, কখনো নিছক রঙ্গ-কৌতুক, আবার কখনো বা সমাজ-শোধন।

বাংলা প্রহসনের উদাহরণ : মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'একেই কি বলে সভ্যতা?' এবং 'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ'—এই দুখানি রচনা বাংলা সাহিত্যের দুটি সেরা প্রহসন। সাহিত্যের ঐতিহাসিক লক্ষ্য করেছেন, এই দুটি রচনার প্রভাবে পরবর্তী বাংলা সাহিত্যে প্রচুর প্রহসন লিখিত হতে থাকে। 'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ' প্রহসনটির নামকরণের প্রভাবে ছড়া-প্রবাদের পঙ্‌ক্তি দিয়েই বাংলা প্রহসনের নামকরণের প্রথার সৃষ্টি হয়। এতে বাস্তবতা, কৌতুক-রঙ্গ-ব্যঙ্গ ভালোভাবে ফোটে। 'একেই কি বলে সভ্যতা?' প্রহসনটিতে 'ইয়ং বেঙ্গল' গোষ্ঠীর মদ্যপানের অতিরেক এবং আধুনিকতার নামে পানভোজনের প্রথাকে ব্যঙ্গ করা হলেও রচনাটির মধ্যে সাহিত্যিক কৌশলেরও অনেক দিকের প্রকাশ ঘটেছে। এটি নিছকই একটি প্রহসন নাটক নয়। 'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ' প্রহসনটিতে প্রাচীনপন্থী মানুষদের অনাচার এবং তাদের শাস্তি প্রদর্শিত হয়েছে। কিন্তু জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'কিঞ্চিৎ জলযোগ' বিশুদ্ধ প্রহসনের চরম দৃষ্টান্ত,—প্রহসনের সংজ্ঞার সব দিক বিচার করে দেখলে নিখুঁত সৃষ্টি,—যদিও ব্রাহ্মধর্মের প্রতি একটু প্রাসঙ্গিক তির্যক মন্তব্য মেলে। 'অলীকবাবু', সেই তুলনায় ততোখানি সফল সৃষ্টি নয়। এর আগে দীনবন্ধু তাঁর 'জামাইবারিক' (শ্বশুরবাড়িতে সব ঘর-জামাইদের 'ব্যারাক',—তার থেকে 'বারিক') প্রভৃতি প্রহসনের মধ্যে হাসির শুচিতা যেন রক্ষা করে উঠতে পারেন নি, কিন্তু জ্যোতিরিন্দ্রনাথ হাসির শুদ্ধতা রক্ষার প্রথম শিল্পী। গিরিশচন্দ্র মূলত সীরিয়াস নাট্যকার, তথাপি তিনি 'পঞ্চরং' আখ্যায় কয়েকটি প্রহসন লিখেছিলেন,—সেগুলির তেমন সাহিত্যিক সাফল্য নেই। কিন্তু গিরিশচন্দ্রের শিষ্য অমৃতলাল বসু ব্যঙ্গাত্মক Satire-ধর্মী প্রহসন রচনা করে বাংলা সাহিত্যে আজও অবিস্মরণীয় হয়ে আছেন। উচ্চ ও অভিজাত সমসাময়িক সমাজের নর-নারীদের বিচিত্র কর্মাবলী তাঁর প্রহসনের মূল লক্ষ্য যদিও কখনো কখনো তিনি রক্ষণশীল দৃষ্টিকোনের পরিচয় দিয়ে ফেলেছেন। সংলাপের ক্ষেত্রে তিনি বিশেষ বৈদগ্ধ্যের প্রমাণ দিয়েছেন। 'বিবাহ বিভ্রাট' তাঁর একটি জনপ্রিয় প্রহসন। 'সম্মতি সঙ্কট', 'বাবু', 'একাকার', 'গ্রামবিভ্রাট' প্রভৃতি তাঁর অন্যান্য প্রহসন। দ্বিজেন্দ্রলালের প্রহসনের মূলধন তাঁর গান। 'কল্কি অবতার' সমকালীন জাতিভেদ প্রথাকে বিদ্রূপ করে রচিত, 'বিরহ' বিশুদ্ধ শ্রেণির প্রহসন, 'আনন্দবিদায়' রবীন্দ্রসাহিত্যের 'প্যারডিমূলক' প্রহসন। বিশুদ্ধ হাস্যরসের দিক থেকে রবীন্দ্রনাথের প্রহসন নাটক 'বৈকুণ্ঠের খাতা' এবং 'গোড়ায় গলদ' দুটি অবিস্মরণীয় সৃষ্টি।

৯২.৮ অনুশীলনী

(ক) নীচের প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন।

(১) কমেডি কথাটির উদ্ভব হয়েছে কোন্ কথাটি থেকে?
(২) কমেডির মূল বিশেষত্ব দুটি কী?
(৩) ট্র্যাজেডি-কমেডির মধ্যে রবীন্দ্রনাথ কোন্ বিভেদকে মান্য করেছেন?
(৪) Burlesque, Travesty, Interlude কথাগুলির অর্থ কী?
(৫) শেকস্‌পীয়ারের কয়েকটি কমেডি নাটকের নাম বলুন।
(৬) High Comedy, Comedy of Humour, Comedy of Manners, Sentimental Comedy প্রভৃতির পরিচয় দিন।
(৭) Purpose Comedy বলতে কী বোঝেন?
(৮) Genteel Comedy এবং Comedy of Intrigue বলতে কী বোঝায়?
(৯) Farce কথাটির উদ্ভব সম্পর্কে আলোচনা করুন।
(১০) জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মলিয়েরের কোন্ প্রহসন দুটির বঙ্গানুবাদ করেন?

(খ) নীচে প্রদত্ত প্রশ্নগুলির বিস্তৃত আলোচনা করুন ঃ

(১) অ্যারিস্টটলের 'Poetics' গ্রন্থে কমেডি সম্পর্কে কী বলা হয়েছে?
(২) কমেডি এবং প্রহসনের মধ্যে পার্থক্য কোথায়?
(৩) কমেডির হাস্যরস সম্পর্কে মন্তব্য করুন।
(৪) কমেডির শ্রেণিভেদ সম্পর্কে আলোচনা করুন।
(৫) বার্নার্ড শ্যর কমেডি নাটকের বিশেষত্ব কী?
(৬) বাংলা কমেডি নাটকের কয়েকটি উদাহরণ দিন ও সে সম্পর্কে আলোচনা করুন।
(৭) প্রহসনের উদ্ভব হয় কী প্রকারে?
(৮) প্রাচীন ভারতীয় প্রহসন নাটকের বিশেষত্ব সম্পর্কে আলোকপাত করুন।
(৯) বাংলা প্রহসন নাটকের উদাহরণসহ আলোচনা করুন।

৯২.৯ পৌরাণিক নাটক ; উদাহরণ

বাইবেলকে আশ্রয় ও অবলম্বন করে মধ্যযুগের ইউরোপে এক বিশেষ নাট্যধারার সৃষ্টি হয়, যাকে বলা হত—Miracle Play। মানুষের সৃষ্টি ও জন্ম, তার পতন, উদ্ধার-মুক্তি-প্রায়শ্চিত্ত ইত্যাদি ছিল এসব নাটকের আলোচ্য বিষয়। প্রথম পর্বে একে বলা হতো Mystery Play, যার থেকে ইউরোপে পরবর্তীকালে সৃষ্টি হয় Miracle Play-এর। এর আলোচ্য বিষয় ছিল, ধর্মীয় মহাপুরুষ এবং সাধুসন্তদের জীবনী ও জীবনলীলা, তাঁদের অলৌকিক ক্রিয়াকর্ম। তাঁদের সম্পর্কে প্রচলিত কিংবদন্তী ও কথা-কাহিনী ইংরেজি সাহিত্যে এর নিদর্শন ত্রিশিচহ্ন, কিন্তু ফ্রান্সে এই ধারাকে অবলম্বন করে বিখ্যাত কথা কাহিনীর ধারা সঞ্জীবিত। এ ধরনের রচনা সংখ্যায় ৪২টি,—মানুষের কর্মকৃতি সেগুলির আলোচ্য বিষয় এবং সবগুলিই শেষ হয়েছে কুমারী মেরীর (অর্থাৎ The Blessed Virgin, যিশুর জননী) অলৌকিক হস্তক্ষেপ। জার্মানিতে এই ধারার সন্ধান মেলে।

Mystery play-র সৃষ্টি হয়েছিল গির্জার প্রার্থনানুষ্ঠানের নিয়ম-বিধি-পদ্ধতির অনুসরণে, সঙ্গে ছিল ঈস্টারের সময় সংলাপমূলক বিশেষ অনুষ্ঠান। অর্থাৎ ধর্মানুষ্ঠানের সঙ্গে মধ্যযুগীয় ইউরোপের নাট্যোৎপত্তির একটি বিশেষ সংযোগ ছিল। ভক্তিভাবের উদ্দীপন ছিল এগুলির লক্ষ্য। প্রথমে এগুলি লাতিন ভাষায় লিখিত হত এবং যাজকদের দ্বারা চার্চেই অভিনীত হত। ক্রমে-ক্রমে তাতে অনুপ্রবেশ করতে থাকে আঞ্চলিক ভাষা, ছোট-ছোট লোকসঙ্গীত বা শোককবিতাও এই সঙ্গে গাওয়া হতে শুরু করে। ফলে এতে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার মধ্যে এক অসাম্প্রদায়িক অনুষঙ্গের সৃষ্টি হয়, প্রয়োজনীয় নাট্যিক অঙ্গভঙ্গিও যুক্ত হয়। ফলে চার্চের অভ্যন্তরে যা অনুষ্ঠিত হতো, তা চার্চের প্রাঙ্গণে এবং সেখান থেকে হাটে-বাজারে অনুষ্ঠিত হতে থাকে। নাট্যরূপ ধীরে-ধীরে দীর্ঘায়ত হতে থাকে, সংলাপে আঞ্চলিক ও স্থানীয় ভাষা বেশি পরিমাণে গৃহীত হতে থাকে। হাট-বাজারের সংস্পর্শে ব্যবসায়ীদের এক-একটি সমবায় সংঘ এক-একটি ধর্মীয় বিষয়-প্রসঙ্গকে প্রাধান্য দিতে থাকে। যেমন, রাজমিস্ত্রিদের সমবায় সংঘ অভিনয় করত নোয়া-সম্পর্কান্বিত কাহিনী (Noah Story), তাঁতিরা অভিনয় করত যিশুর ক্রুশবিদ্ধ হবার কাহিনী। এইভাবে বাইবেলের এক-একটি অংশের কাহিনীর নাট্যাভিনয় করা হতো। যবনিকা দেওয়া বগিগাড়ির (Wagon) ওপর অভিনয় করা হত, নীচের দিকে থাকত সাজঘর। এক জায়গার অভিনয় প্রদর্শন হয়ে গেলে অন্য জায়গায় সেই বগি ঠেলে নিয়ে যাওয়া হতো, এবং বাইবেলের এক-একটি অংশের পর-পর অভিনয় করা হতো। এইভাবে এক একটি পর্বকে বলা হতো—'York'। তা হতো ৪৮টি খণ্ডকাহিনীর সমাহার। অধিকাংশ নাট্যরচনাগুলিই নামহীন রচকের। পদ্যাংশ অতি সাধারণ মানের, চরিত্রাভিনয়ও স্থূল প্রকারের।

আশ্চর্যের কথা এই ভারতীয় পৌরাণিক নাটকেরও উদ্ভবকথা প্রায় এরই কাছাকাছি সময়ে। চার্চের অভ্যন্তর থেকে চার্চের বাইরের প্রাঙ্গণে এসে অভিনয় করাকে বলা হত Profane (অর্থাৎ যা 'অপবিত্র', যাজকদের জন্য নয়, যা সাধারণ মানুষদের জন্য। 'Profane' কথাটির উদ্ভব হয়েছে 'Pro fano' থেকে, যার অর্থ 'গির্জা বা মন্দিরের বাইরে')। গির্জার বাইরের প্রাঙ্গণের সঙ্গে তুলনীয় হল— 'নাটগীতি'— দেবমন্দিরের সংলগ্ন নাটমন্দিরে যে গীতি-অভিনয় হত। প্রাচীন ভারতে এক-একটি নাট্যদল গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ঘুরে ঘুরে নাট্যাভিনয় করত। এসব নাটকের বেশির ভাগই দেবলীলা বিষয়ক কিংবা বিভিন্ন পুরাণ গ্রন্থ থেকে গৃহীত এক-একটি কাহিনীর নাট্যরূপ। এজন্যেই এগুলির নাম—পৌরাণিক নাটক (Mythological Play)।

এইখানে 'ভক্তিমূলক নাটক' (Devotional Play) এবং 'পৌরাণিক নাটকে'র (Mythological Play) মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করতে হবে। ভক্তিমূলক নাটকে ভক্তিভাব উৎসারণ ও উদ্দীপনটাই বড়ো কথা, সেটাই এর মূল লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য। তা একটি নাটক খাঁটি নাটক হয়ে উঠল কি না, সেটাও সেখানে তেমন বড়ো কথা নয়। কিন্তু খাঁটি পৌরাণিক নাটকে পুরাণাশ্রিত কাহিনী যেমন থাকবে, পৌরাণিকঅনুষঙ্গকে যেমন সাধারণভাবে লঙ্ঘন করা চলবে না, তেমনি নাটকের চরিত্রায়ণের ক্ষেত্রে বা গঠনতত্ত্বের ক্ষেত্রে তাকে একটি নাটকের সকল নিয়ম-বিধিকে মেনে চলতে হবে। পৌরাণিক নাটকের মধ্যেও ভক্তিভাব থাকতে পারে, থাকেও কিন্তু সেই ভক্তিভাব উদ্দীপনের ক্ষেত্রে অন্যান্য নাটকের সাধারণ নিয়মাবলী নাট্যকারকে অবশ্যই পালন করতে হবে। ভক্তিমূলক উদ্দীপনের ক্ষেত্রে অন্যান নাটকের সাধারণ নিয়মাবলী নাট্যকারকে অবশ্যই পালন করতে হবে। ভক্তিমূলক নাটকের ভাবানুষঙ্গ মোটামুটি ভাবে অলঙ্ঘ্য, তার নাট্যায়নও তেমন উচ্চ কলা-কৌশলমূলক নয়। কিন্তু পৌরাণিক নাটকে অনেক সময় নাট্যকার অভিনব কোনো অর্থ-ব্যঞ্জনার সঞ্চার করতে পারেন। একই ভীষ্ম চরিত্র নিয়ে ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এবং দ্বিজেন্দ্রলাল রায় নাটক লিখেছেন। কিন্তু দুজনের চিন্তায় সেই ভীষ্ম ভিন্নরূপে প্রকাশিত। নাট্যকার মন্মথ রায় তাঁর 'কারাগার' নাটকে কংসের কারাগারকে পরাধীন ভারতবর্ষ রূপে ব্যঞ্জিত করেছেন। পৌরাণিক

নাটককে প্রথমে হতে হবে একটি নাটক, নাট্যশিল্পের সকল দাবি তাকে মেটাতে হবে, পরে তার পুরাণাশ্রিত বিষয় ও কাহিনী। ভক্তিমূলক নাটকে ভক্তিভাবটিই প্রধান লক্ষ্য, নাট্যশিল্পের দাবিপূরণটি নয়। ভক্তিমূলক নাটকের সঙ্গে যাত্রা-র একটি বিশেষ যোগ আছে। যাত্রার বিশিষ্ট ভাবানুষঙ্গ ও উপস্থাপনের রীতিগত বৈশিষ্ট্য, অভিনয়প্রথা—সবই ভক্তি-উৎসারণের পরিপোষক ও অনুকূল। অবশ্য বর্তমান কালে যাত্রা অনেক বিবর্তন ঘটেছে এবং তা নিয়মিত নাটকের কাছাকাছি চলে এসেছে।

বাংলা নাটকের প্রাথমিক যুগে 'অপেরা' বা গীতাভিনয়ের মাধ্যমে ভক্তিভাব উৎসারণে যাঁদের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য, তাঁদের মধ্যে মনোমোহন বসুর নাম করতে হয়। এ-ধরনের রচনা ছিল যাত্রা এবং খাঁটি নাটকের মাঝামাঝি স্তরের সৃষ্টি। 'রামাভিষেক', 'সতী', 'হরিশ্চন্দ্র' প্রভৃতি তাঁর রচনা। করুণরসকেই তিনি বিশেষ প্রাধান্য দিয়েছেন। অতঃপর রাজকৃষ্ণ রায় রামায়ণের কাহিনী অবলম্বনে কয়েকটি নাটক লেখেন। সীতার অগ্নিপরীক্ষা নিয়ে রচিত 'অনলে বিজলী'তে তিনি অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রয়োগ করেন।

গিরিশচন্দ্রই বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ পৌরাণিক নাট্যকার। তিনি জানতেন, ভক্তিভাব বাঙালির এক জাতীয় মনোভাব। সেই মনোভাবটিকেই তিনি নানা পৌরাণিক নাটকের মধ্যে ফুটিয়ে তুলেছিলেন। 'পাণ্ডব গৌরব' ও 'জনা' তাঁর শ্রেষ্ঠ দু'খানি পৌরাণিক নাটক। ভক্তিভাবের আতিশয্যের কারণে 'জনা' নাটকের শেষে একটি 'ক্রোড় অঙ্ক' যোজনা করেন, যা সমালোচনার কারণ হয়েছিল। তবে একথাও আমাদের মনে রাখতে হবে যে, এটি 'অতিরিক্ত' একটি অঙ্ক,—নাটকের অঙ্কের মধ্যে বিবেচ্য নয়। গিরিশচন্দ্রের পর দ্বিজেন্দ্রলাল ও ক্ষীরোদপ্রসাদ পৌরাণিক নাটক লেখেন। ঐতিহাসিক নাটকে দ্বিজেন্দ্রলাল যে-প্রতিভার পরিচয় দিতে পেরেছেন, 'পাষাণী' বা 'সীতা'তে তা দিতে পারেননি। বরং অমিত্রাক্ষর ছন্দের সার্থক প্রয়োগে এবং ভীষ্মচরিত্রের পরিকল্পনায় তাঁর 'ভীষ্ম' নাটকটি একটি উল্লেখযোগ্য নাট্যকর্ম। ভীষ্ম চরিত্র নিয়ে ক্ষীরোদপ্রসাদ নাটক লিখলেও তাঁর শ্রেষ্ঠ পৌরাণিক নাটক 'নব-নারায়ণ'। এই নাটকের কর্ণ চরিত্র বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ঊনবিংশ শতাব্দীর পৌরাণিক নাট্যধারা নানা সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাহিত্যিক কারণে স্তব্ধ হয়ে যায়। পরবর্তীকালে মন্মথ রায়, যোগেশ চৌধুরী প্রভৃতি নাট্যকারেরা নব মানবিকতার ভাবরসে উদ্বুদ্ধ হয়ে পৌরাণিক নাট্যরচনায় উদ্যোগী হন। মন্মথ রায়ের 'কারাগার', 'দেবাসর', 'সাবিত্রী', 'চাঁদ সদাগর' প্রভৃতি পৌরাণিক নাটকের মধ্যে 'কারাগার' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যোগেশচন্দ্র চৌধুরী তাঁর পৌরাণিক নাটক 'সীতা'র মধ্যে অর্ন্তদ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে অভিনবত্বের পরিচয় দিয়েছেন।

৯২.১০ ঐতিহাসিক নাটক, উদাহরণ

যে নাটক ইতিহাসভিত্তিক, তাই ঐতিহাসিক নাটক। এখানে ইতিহাসের ঘটনার কালানুক্রমকে ও ঘটনার বিশুদ্ধিকে যে রকম রক্ষা করতে হবে, তেমনি চরিত্রের পরিকল্পনায়, নাট্যশিল্পের অনুসরণে তাকে খাঁটি নাটক হয়েও উঠতে হবে। অর্থাৎ ইতিহাস ও নাটকের সংমিশ্রণের ফলে সৃষ্টি হলো—ঐতিহাসিক নাটক। ঐতিহাসিক নাটকের মূল লক্ষ্য হল, যে যুগ-কাল-পরিস্থিতিতে নাটকটি কল্পিত হয়েছে, সেই সময়কার ভাবানুষঙ্গ অনুসারে একটি 'ঐতিহাসিক রস' ফুটিয়ে তোলা, অপরদিকে ঐতিহাসিক চরিত্র অবলম্বন করে, অতীতের মধ্যে চিরকালের উপস্থিতিকে আবিষ্কার করা। যে নাট্যকার এই দুইদিকের মধ্যে সমন্বয় সৃষ্টি করতে পারেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক নাট্যকার। পৌরাণিক নাটকের মতো ঐতিহাসিক নাটককেই প্রাথমিকভাবে হয়ে উঠতে হবে একটি নাটক, পরে তার বিষয়গত ইতিহাস-ভাবনার দিকটির কথা। এখানেও একই ঐতিহাসিক চরিত্র দুই নাট্যকারের যুগ ও ব্যক্তিমানসের ভিন্নতা অনুসারে

ভিন্ন হয়ে যায়। যেমন, 'ক্লিওপেট্রা' চরিত্রটি। একই ক্লিওপেট্রা চরিত্র নিয়ে শেকস্‌পীয়র ও বার্নার্ড শ্য নাটক লিখেছেন। কিন্তু দৃষ্টিকোণের স্বাতন্ত্র্যের কারণে সেই ক্লিওপেট্রা ভিন্নরূপে প্রদর্শিত।

ঐতিহাসিক নাটকের প্লটের গঠনরীতি সম্পর্কে যিনি সর্বাগ্রে আলোচনা করেছেন, তিনি অ্যারিস্টটল। তাঁর 'Poetics' গ্রন্থে তিনি ট্র্যাজেডির প্লট নিয়ে আলোচনা কালে, প্রসঙ্গাক্রমে, ঐতিহাসিক নাটকের প্লটের কথাও তুলেছেন। চরিত্রের চেয়েও তিনি প্লটকে ওপরে স্থান দিয়েছেন। অবশ্য, প্লটকে তিনি সর্বাত্মক একটি নাট্যপরিকল্পনা বলে মনে করেন। নাট্যকার এমনভাবে কাহিনী-ঘটনার ঐক্য-অখণ্ডতাময় উপস্থাপনা করবেন, চরিত্রের Action-এর মাধ্যমে তার চিন্তা-উদ্দেশ্য-Dianoia কে তুলে ধরবেন যেন লাট্য-পরিণতিতে উদ্দিষ্ট ফল লাভ করা যায়। অ্যারিস্টটল যেমন নাট্যরূপের দিকটিকে ব্যক্ত করেছেন, রবীন্দ্রনাথ তেমনি বঙ্কিমচন্দ্রের ঐতিহাসিক উপন্যাস 'রাজসিংহ' নিয়ে আলোচনাকালে ঐতিহাসিক ভাব ও রসের কথা বলেছেন। রবীন্দ্রনাথের মতে, ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিক (বা নাট্যকার) যেন পাঠককে (দর্শক) মহাকালের দরবারে নিয়ে যান—অর্থাৎ অতীতের সমুন্নতিময় এক বৃহৎ সত্তার ক্ষেত্রে নিয়ে যান। একে যেন এক ধরনের সাহিত্যিক মুক্তির আস্বাদ দেওয়া বলা যায়। এ হলো ইতিহাসের দেশ-কালাতীত বৃহৎ অঙ্গনে পাঠক-দর্শককে নিয়ে এক চিরন্তন সত্যের মধ্যে তাদের মুক্তি দেওয়া।

তবে সেই কর্মসাধনের জন্য ঐতিহাসিক নাট্যকারের কিছু সাহিত্যিক স্বাধীনতাও আছে। ইতিহাসের মূল মর্মকথাটিকে ব্যক্ত করবার জন্য কিংবা তিনি যে অভিনব সত্যটিকে সেই নাটকে মুখ্য করে তুলতে চান, সেজন্য ইতিহাস-বহির্ভূত কোনো চরিত্রকে গ্রহণ করতে পারেন। কিন্তু দেখতে হবে সে চরিত্র অনৈতিহাসিক হলেও নাটকের ঐতিহাসিক পরিবেশের সঙ্গে যেন সামঞ্জস্যমূলক হয়ে ওঠে এবং দ্বিতীয়ত, সেই চরিত্রগুলির যেন নাটকীয় মূল্য ও নাটকীয় তাৎপর্য থাকে। নাটকের অন্তর্গত কালগত ঐতিহাসিক পরিবেশের পক্ষে স্বাভাবিক-সঙ্গত-সামঞ্জস্যমূলক না হলেই সে চরিত্র কালানৌচিত্য দোষে দুষ্ট হয়ে উঠবে। একেই বলা হয় Anachronism। যেমন দ্বিজেন্দ্রলালের 'সাজাহান' নাটকে সুজার পত্নী পিয়ারা কীর্তনগান গেয়েছে। একটি মুসলমান চরিত্রের পক্ষে, এই বিশেষ ধরনের গান নাটকের ভাব-পরিবেশের পক্ষে সঙ্গত হয়নি। কিন্তু গিরিশচন্দ্রে 'সিরাজদ্দৌল্লা' নাটক করিমচাচা চরিত্র বা শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের একই নামের নাটকে আলেয়া বা গোলাম হোসেন চরিত্র অনৈতিহাসিক ও কাল্পনিক চরিত্র,—তবে নাটকের ভাবগত পরিবেশের দিক থেকে অস্বাভাবিক বা অসামঞ্জস্যমূলক বলে মনে হয়না। নাট্যকার যদি কোনো ঐতিহাসিক চরিত্র বা নাটকের মাধ্যমে কোনো অভিনব ভাবসত্যের ব্যঞ্জনা ফুটিয়ে তুলতে চান, তবে তাঁকেও সমগ্র নাট্যপরিবেশের পক্ষে সহজগ্রাহ্য ও স্বাভাবিক হতে হবে। কেবল চরিত্র পরিকল্পনাতেই নয়, নাটকের পরিস্থিতিতে সংলাপে, দৃশ্য পরিকল্পনায়, সর্বত্রই নাট্যকারকে ঐতিহাসিক পরিবেশ ও পরিমণ্ডল সম্পর্কে সজাগ থাকতে হয়।

কেন নাট্যকারেরা ঐতিহাসিক নাটক লিখতে অনুপ্রাণিত হন? ইতিহাসের মধ্যে আছে এক রোমান্টিক পরিমণ্ডল, তার কাহিনীতে আছে আখ্যানের চমকপ্রদ দিক, চরিত্রের মধ্যে আছে চিরকালীন মানুষের আবেগ-উৎকণ্ঠা-দ্বন্দ্ব। সে রাজ্যে প্রবেশ করে নাট্যকার যেমন, দর্শকও তেমনি এক রোমাঞ্চ অনুভব করেন। বর্তমানের বাস্তবজীবনের চেয়ে অতীতের সেই ফিরে পাওয়া জীবনের মহিমা কোনো অংশেই কম কিছু নয়। ইতিহাসের পুরুজ্জীবনের মধ্যে মানুষ তারই মতো এক মানুষের কর্মকৃতি ও সাফল্য-অসাফল্য দেখে এক মানবিক আত্মীয়তার পরিচয় লাভ করে। ঐতিহাসিক নাটকের মধ্যে সচরাচর ট্র্যাজিডির প্রাধান্যই লক্ষ্য করি আমরা।

বিশ্বের সকল দেশের নাট্যসাহিত্যের ভাণ্ডারে ঐতিহাসিক নাটকের নিদর্শন সঞ্চিত আছে। বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে তার সফল দৃষ্টান্ত মেলে অনেকই। এখানে তার কিছু দৃষ্টান্ত দেওয়া হলো ঃ

মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'কৃষ্ণকুমারী নাটক' টডের 'রাজস্থান' গ্রন্থ অবলম্বনে লিখিত বটে, কিন্তু

কৃষ্ণকুমারীর চরিত্র পরিকল্পনায়, তাঁর পিতা ভীমসিংহ ও মাতা অহল্যার ক্রন্দন-বেদনায় আমরা বিশেষ ভাবে অভিভূত হই। দেশ ও পিতার মান রক্ষার জন্য কৃষ্ণকুমারীকে মৃত্যুবরণ করতে হয়। ইতিহাসে ছিল, কৃষ্ণকুমারীকে বিষ দিয়ে হত্যা করা হয়। মাইকেল কিন্তু সুন্দর একটি নাট্যপরিস্থিতি নির্মাণ করে, কৃষ্ণকুমারীকে ছুরিকা দ্বারা আত্মহত্যা করিয়ে তাঁকে মহনীয়া করে তুলেছেন। গ্রিক ট্র্যাজেডির মতো এখানে দৈবশক্তি বা নিয়তি একটি বড়ো ভূমিকা নিয়েছে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর ঐতিহাসিক নাটকের মধ্যে স্বাদেশিকতার দিকটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। তাঁর 'সরোজিনী' নাটকের বিষয় 'কৃষ্ণকুমারী'র অনুরূপ হলেও চিন্তা ভিন্ন। গিরিশচন্দ্রের ঐতিহাসিক নাটকের বিশেষত্ব দুটি : এক, ইতিহাসের তথ্যকে নিষ্ঠাভরে অনুসরণ করা। দুই, স্বাদেশিকতার প্রচার। 'সিরাজদ্দৌলা' নাটকের অনৈতিহাসিক চরিত্র করিমচাচা এক অবিস্মরণীয় চরিত্র। 'মীরকাশিম' ও 'ছত্রপতি শিবাজী' তাঁর আর দুখানি সফল ঐতিহাসিক নাটক। বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক নাট্যকার হলেন—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। প্রাচীন হিন্দুযুগ, মুঘল যুগ এবং রাজপুত যুগ—তিন যুগ নিয়েই তিনি ঐতিহাসিক নাটক লিখেছেন। এগুলির মূল সুর একদিকে স্বাদেশিকতা, অন্যদিকে জীবন-প্রতিভাস। 'চন্দ্রগুপ্ত',. 'সাজাহান', 'নূরজাহান', 'মেবার পতন' প্রভৃতি নাটক এই বিষয়ের বিশিষ্ট উদাহরণ। ঐতিহাসিক নাটকের মধ্যে যে এক মানবমহিমা ও মহনীয়তা আছে, দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ঐতিহাসিক নায়ক-নায়িকাগণও যে কাতর হন, সংলাপ ও নাট্যরসের উদ্দীপক হতে পারে, দ্বিজেন্দ্রলালের ঐতিহাসিক নাটক তারই নিদর্শন। ক্ষীরোদপ্রসাদ ঐতিহাসিক নাটকের মধ্যে তথ্যনিষ্ঠা তেমন প্রদর্শন করেন নি। তাঁর 'প্রতাপাদিত্য', 'আলমগীর' প্রভৃতি নাটক খ্যাতি অর্জন করেছিল। পরবর্তী যুগের নাট্যকারদের মধ্যে শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের 'সিরাজদ্দৌলা', মহেন্দ্র গুপ্তের 'মহারাজ নন্দকুমার' টিপু সুলতান', নিশিকান্ত বসু রায়ের 'বঙ্গো বর্গী' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা ও তার জন্য প্রয়াস এই সব নাটকগুলির সাধারণ বৈশিষ্ট্য।

৯২.১১ সামাজিক নাটক ; উদাহরণ

সামাজিক নাটকের প্রসঙ্গে বিশেষভাবে স্মর্তব্য কথা হলো, সাহিত্যের ক্ষেত্রে যতদিন বাস্তবতা (Relaism)-র উদ্ভব হয়নি, ততদিন সামাজিক নাটকও খাঁটি অর্থে লিখিত হয়নি। ১৮৩০-এর পর থেকে বাস্তববাদের প্রসঙ্গে মানুষের মনে চেতনা এসেছে। দ্বিতীয়ত, সাহিত্যে বাস্তববাদের প্রথম প্রকাশ দেখা গেছে উপন্যাসে, নাটকের ক্ষেত্রে তার প্রকাশ ঘটেছে একটু পরে। সামাজিক নাটকের পরিচয় ও প্রবর্তন প্রসঙ্গে এই দুটি কথা সকলের আগে মনে রাখতে হবে। মূলত রোমান্টিক ভাববাদের প্রতিক্রিয়ায় সামাজিক নাটক রচিত হতে থাকে।

পৌরাণিক নাটকের ভাবপ্রতিবেশ যেমন দূর আকাশের অতিলৌকিক জগৎ, ঐতিহাসিক নাটকের ভাবপ্রতিবেশ তেমনি অতীতের এক রোমান্টিক জগৎ। খাঁটি বাস্তবের চেনা-শোনা জগতের সহজ-স্বাভাবিক চরিত্র ও পরিবেশ সহজবোধ্য কারণেই সেখানে পাবার নয়। কিন্তু অতিলৌকিক ও অতীতের কল্পনার জগৎ ছেড়ে প্রতিদিনকার নিতান্ত পরিচিত ও বর্তমান জগতের সমস্যাবলী ও তার প্রতিরূপ নিয়ে রচিত নাটক বেশি হৃদয়গ্রাহী। এই কারণে সামাজিক নাটকের চাহিদা ও আকর্ষণ দুই-ই বেশি।

সামাজিক নাটকের মধ্যে দুটি দিক আছে। এক, প্রতিদিনকার পরিচিত, তুচ্ছ-নগণ্য জগৎ ও জীবনের প্রত্যক্ষ রূপায়ণ। সেখানকার প্রেম-রোমান্স, ঘর-গেরস্থালির প্রাতচ্ছবি সহজেই মনকে নাড়া দিয়ে যায়। দুই, প্রতিদিনকার তুচ্ছ পারিবারিক জীবনের বাইরে যে সামাজিক জীবন আছে, নানা অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক চিন্তা ও সমস্যা দ্বারা জীবন যেখানে ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে, তার পরিচয় প্রদান করা। বস্তুত, এই দ্বিতীয় দিকটিই সামাজিক নাটকের আধুনিক ও প্রকৃত দিক। নানাপ্রকার সামাজিক-অর্থনৈতিক সমস্যার উত্থাপন, তার আলোচনা, এবং শেষে তার নাট্যসম্মত সমাধান যে সব নাটকে থাকে তাকেই

বলা যায় 'Problem Drama' বা 'সমস্যামূলক নাটক'। এই ধরনের নাটকের মধ্যে বাহ্য ঘটনার আলোড়ন-আন্দোলন-রূপায়ণ অপেক্ষা সংলাপের মার্জিত তীক্ষ্ণতা এবং বিতর্কের প্রকাশ অধিক। নাট্যকারের নির্দেশনাও বিস্তৃত ও দীর্ঘায়ত। চরিত্র পরিকল্পনার মধ্যে এক একটি ভাবনাব ধারক-বাহকের দিকটিই যেন বড়ো এবং প্রধান হয়ে ওঠে। Hero বা নায়ক বলতে প্রাচীন ধারণাকে বর্জন করে 'Anti-Hero' -র ধারণাই এখানে কার্যকরী ভাবে রূপায়িত হয়। দৃশ্যসজ্জায় থাকে দৈনন্দিন জীবনের অতি পরিচিত দিক, ঘটনা-নির্বাচনেও তাই-ই। সংলাপের মধ্যে স্বগতোক্তি তবু এখানে সহনীয়, কিন্তু Aside বা জানান্তিক-উক্তি এখানে সম্পূর্ণ বর্জনীয়, কেননা তা বাস্তব জগতের পক্ষে অসামঞ্জস্যমূলক।

বাংলা সাহিত্যের ঐতিহাসিক লক্ষ্য করেছেন, বাংলা নাটকে সামাজিক ও বাস্তব সমস্যার প্রথম রূপায়ণ ঘটেছে প্রহসন নাটকে। প্রহসন নাটকের লঘু-তারল্যের বাতায়ন পথ দিয়েই বাংলা সামাজিক নাটকের প্রবর্তন ঘটেছে। তবে সামাজিক নাটকের নানা প্রকারভেদ ও মাত্রাভেদ আছে। দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণ' নাটকটিকে সহজে কেউ একটি সামাজিক নাটক বলতে চাইবেন না, অথচ এটিকে একটি সামাজিক বা সামাজিক সমস্যার নাটক বলাও যায়। প্রথমত, এই নাটকে সামাজিক ও গার্হস্থ্য-জীবনের অনেক চিত্র আছে, দ্বিতীয়ত, নীলচাষকে কেন্দ্র করে এর মধ্যে একটি অর্থনৈতিক সমস্যার দিকও আছে, নীলকরগণের অত্যাচারে জর্জরিত শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বিন্দুমাধব কৃষি অর্থনীতিকে পরিত্যাগ করে চাকুরজীবী হতে চায় সেখানে। কিংবা, স্বদেশী মহাজনদের অত্যাচারে ধান-চাষীরা নীলের দাদন নিতে বাধ্য হয় যেখানে। সেদিক বিচার করলে গিরিশচন্দ্রের 'বলিদান' বা 'শাস্তি কি শান্তি' প্রভৃতি নাটক খাঁটি সামাজিক নাটক। দুটিতেই পারিবারিক সমস্যার কথা আলোচিত হয়েছে,—নাটক হিসেবে অবশ্য 'বলিদান' সার্থক। বাঙালি পিতা-মাতার জীবনে কন্যাদায় একটি বড়ো সমস্যা, কন্যার বৈধব্যও তেমনি গুরুভার সমস্যা। গিরিশচন্দ্র সেই দুই পারিবারিক সমস্যার রূপ দিয়েছেন এই দু'খানি নাটকে। দ্বিজেন্দ্রলাল পরবর্তীকালে 'বঙ্গনারী' নাটকে 'বলিদান' নাটকের সমস্যার পুনঃপ্রবর্তন করেছেন, যদিও সামাজিক নাটকের মধ্যে রোমাঞ্চকর ঘটনার অবতারণা যথার্থ হয়নি। রবীন্দ্রনাথ 'চোখের বালি'র মতো সামাজিক উপন্যাস এবং নানা ধরনের নাটক লিখলেও সামাজিক নাটক লেখেননি। বরং রবীন্দ্রোত্তর কালপর্বেই বাংলা সামাজিক নাটকের প্রচলন অধিকমাত্রায় ঘটেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, পঞ্চাশের মন্বন্তর এবং দেশবিভাগ বাঙালির চেতনাকে যে গভীরভাবে নাড়া দিয়ে গেছে, তাতে বাঙালি একদিকে বাস্তবের পৃথিবীতে পদার্পণ করেছে, অন্যদিকে নানা প্রকার সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে। এর ফল সামাজিক ও সমস্যামূলক নাটকের প্রচলন বেড়েছে। গণনাট-আন্দোলনের অবদানও এখানে বিশেষভাবে বলবার। রবীন্দ্র-পরবর্তী এবং দেশবিভাগোত্তর কালের নাট্যকারগণ পাশ্চাত্য নাট্যকলাকে যেমন গ্রহণ করেন তেমনি পাশ্চাত্য নাটকের অনুবাদের মাধ্যমেও সামাজিক নাটকের নানাদিক সম্পর্কে অবহিত হন। এ বিষয়ে নরওয়ের নাট্যকার হেনরিক, ইবসেন, ইংলণ্ডের নাট্যকার বার্নার্ড শ্য বা জন গলস্ওয়ার্দি তাঁদের পথ-প্রদর্শক হয়ে আছেন। তবে এইসব পাশ্চাত্য নাট্যকারগণ তাঁদের সামাজিক এবং সমস্যামূলক নাটকের মধ্যে দুটি বিশেষত্বের সৃষ্টি করেছেন, নাট্যশিল্পের পক্ষে যা উন্নতির কারণ হয়ে ওঠেনি। যেমন, নাটকের মধ্যে অতিমাত্রায় তর্ক বিতর্কের আয়োজন। দ্বিতীয়ত, নাট্যকারগণ নিজেরাই যেন নিজ-তত্ত্বসহ নাটকে উপস্থিত,—বিশেষ কোনো চরিত্রকে আশ্রয় করে।

বাঙানিল নাট্যকারগণ সামাজিক নাটকের মূল প্রেক্ষাপট বলতে মধ্যবিত্ত ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত অর্থনৈতিক পরিবেশকে গ্রহণ করেছেন। এই অর্থনৈতিক পরিবেশ ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের মধ্যে তাঁরা সমস্যা ও তার স্বরূপকে প্রদর্শন করতে চেয়েছেন। নাট্যকার বিধায়ক ভট্টাচার্য তাঁর 'মাটির ঘর' বা 'মেঘমুক্তি' প্রভৃতি নাটকগুলিতে এই পটভূমিকাই গ্রহণ করেছেন। 'মাটির ঘরে' তিন বিবাহিতা বোনের প্রেম ও দাম্পত্য সমস্যার রূপ মেলে,

পরিণতিও করুণ। 'মেঘমুক্তি' তেও দাম্পত্য সমস্যার নাটকীয় রূপ পাওয়া যায়। দাম্পত্য সমস্যা শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের 'স্বামী-স্ত্রী' বা 'তটিনীর বিচার' প্রভৃতি নাটকের বিষয় হলেও তিনি সমস্যার রূপায়ণ ও গ্রন্থিমোচনে তেমন সাফল্য অর্জন করেননি। কথাসাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ক'খানি নাটকও লিখেছেন। 'দুইপুরুষ' নাটকের নামের মধ্যেই পিতা-পুত্রের দ্বন্দ্ব ব্যক্ত, সেই তুলনায় 'পথের ডাক' নাটকে এ যুগের অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যার রূপায়ণ অধিকতর স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ। সামাজিক ও সমস্যামূলক নাটক অতঃপর তার নিজস্ব গতিতে অগ্রসর হয়ে চলেছে।

৯২.১২ অনুশীলনী

ক) নীচের প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন।

১) Miracle Play বলতে কী বোঝানো হয়?
২) Miracle Play গুলির পরিণতি কার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হত?
৩) Mystery Play-র সাধারণ পরিচয় দিন।
৪) 'Pro fano' পদটির অর্থ কী? Mystery Play-র সঙ্গে এর যোগ কোথায়?
৫) 'অপেরা' কথাটি বাংলা নাট্যের ক্ষেত্রে কী অর্থে প্রযুক্ত হত?
৬) শ্রেষ্ঠ বঙ্গীয় পৌরাণিক নাট্যকার কে? তাঁর দুখানি পৌরাণিক নাটকের নাম বলুন।
৭) মন্মথ রায়ের কোন্ পৌরাণিক নাটকটির নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য?
৮) ক্লিওপেট্রা চরিত্র নিয়ে কোন্ কোন্ নাট্যকার নাটক লিখেছেন?
৯) ঐতিহাসিক নাটকের প্লটের গঠনরীতি সম্পর্কে অ্যারিস্টটল কী বলেছেন?
১০) 'Anachronism' কথাটির অর্থ কী?
১১) 'Problem Drama' কথাটির অর্থ কী?
১২) 'নীলদর্পণ' কে কি সামাজিক সমস্যার নাটক বলা যায়?

খ) নীচে প্রশ্নগুলির বিশদ উত্তর দিন।

১) Miracle Play এবং Mystery Play-র সঙ্গে বাংলা পৌরাণিক নাটকের যোগ কিভাবে অনুভব করা যায়?
২) 'ভক্তিমূলক নাটক' এবং 'পৌরাণিক নাটকে'র মধ্যে পার্থক্য কোথায়?
৩) ঐতিহাসিক নাটকের সংজ্ঞা প্রসঙ্গে আলোচনা করুন।
৪) কেন নাট্যকারগণ ঐতিহাসিক নাটক লিখতে উদ্বুদ্ধ হন?
৫) সামাজিক নাটকের সংজ্ঞা ও পরিচয় দিন।

৯২.১৩ সাংকেতিক নাটক ; উদাহরণ

যে নাটকের মূল ভাবনা স্পষ্ট-প্রত্যক্ষ ঘটনার দ্বারা ব্যঞ্জিত না হয়ে কোনো ভাব-সংকেত বা বস্তু সংকেতের মাধ্যমে ব্যঞ্জিত হয়, সাধারণ ভাবে তাকেই বলা যায় 'সাংকেতিক নাটক'। সাংকেতিক বলতে Symbolic। Symbol এবং Allegory-র মধ্যে পার্থক্য আছে, আমরা অনেকেই সে বিষয়ে অনেক সময়েই সতর্ক থাকি না। Allegory-র অর্থ—রূপক, সাহিত্যের ক্ষেত্রে বলা যায়. একটি রচনার প্রাথমিক ও বাহ্যিক একটি অর্থ, কিন্তু অন্তরে তার প্রকৃত আর একটি অর্থ। রূপকে তাই অর্থের দুটি মাত্রা বা ধারা থাকে। সংকেত হল সমগ্র ভাবটির একটির অর্থ যেখানে প্রকাশিত হয়।

আসলে বাংলায় যাকে 'সাংকেতিক নাটক' বলা হয়, পাশ্চাত্য সাহিত্যে তাকে বলা হয়—Expressionistic Play। Expressionism বলতে 'অভিব্যক্তিবাদ' কথাটি বাংলায় চালু থাকলেও 'অভিব্যক্তিবাদমূলক নাটক' না বলে বাংলায় 'সাংকেতিক নাটক' কথাটিই প্রচলিত হয়ে গেছে। বাংলাতে এর পরেও আবার কেউ কেউ রূপক ও সাংকেতিক নাটককে অভিন্ন বলে মনে করেছেন। প্রমথনাথ বিশী রূপক-সাংকেতিক আখ্যার এই বিতর্কের কথামনে রেখে 'তত্ত্ব-নাটক' আখ্যার প্রবর্তন করেছেন। রূপক-সাংকেতিক আখ্যার এই সংশয় বিতর্ক আজও ঘোচেনি। প্রতিষ্ঠিত সমালোচকগণও অনেকেই 'রূপক' ও 'সাংকেতিক' নাটক বলতে অভিন্ন ধারার নাটককে বুঝিয়ে থাকেন।

'সাংকেতিক নাটক' আখ্যার প্রচলনের একটি কারণ অনুমান করা যায়। ইউরোপে এক বিশেষ পর্বে Symbolic গীতিকবিতার প্রবর্তন ঘটে। মনে হয়, Symbolic গীতিকবিতার অনুসারে Symbolic Drama'-র কল্পনা এসে গেছে, এবং তারই বঙ্গানুবাদ—'সাংকেতিক নাটক'। 'রবীন্দ্রসৃষ্টিসমীক্ষা'য় শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন,—"জীবনের এই অতীন্দ্রিয় রহস্য ও সাংকেতিকতা সর্বপ্রথম গীতিকবিতার ছন্দে বাঁধা পড়ে। কিন্তু যতই এই লীলাময় বিকাশ সুস্পষ্ট হইতেছে, যতই ইহা ব্যক্তিগত অনুভূতির সীমা ছাড়াইয়া সাধারণ পাঠকের চিত্ত স্পর্শ করিতেছে, বিশেষত মানবমন যতই ইহার আনন্দময় ঘাত-প্রতিঘাত সম্বন্ধে একটা সাগ্রহ কৌতূহল অনুভব করিতেছে, ততই ইহা গদ্যকবিতার রাজ্য অতিক্রম করিয়া নাটকের বিষয়ীভূত হইয়া উঠিতেছে।" তাঁর মনে, সাংকেতিক নাটকের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সর্বত্রই 'আধ্যাত্মিক' না হয়ে অন্য কোন 'গূঢ় জীবনসত্য' হতে পারে। দ্বিতীয়ত, সেই 'গুঢ় জীবনসত্যে'র প্রতীক-সংকেতের দিকটিকে কোন বিশেষ ভাব বা বস্তু দিয়ে নাটকে পুনঃপুনঃ উল্লেখ করা কিংবা বিশেষভাবে তার ওপর গুরুত্ব ব্যাপ্ত করা।

যাই হোক, Symbolic-ই হোক আর Expressiontic-ই হোক সেই নাট্যধারার একটি বিশেষ ইতিহাস আছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের (১৯১৪-১৯১৮) আরম্ভের পূর্ব থেকেই, 'প্রকৃতিবাদ' (Naturalism) এবং 'বাস্তববাদ' (Realism) এর বিরুদ্ধে জার্মানিতে একটি আন্দোলন গড়ে ওঠে। চিত্রে, সঙ্গীতে, সাহিত্যে ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে সেই আন্দোলনটি সক্রিয় হয়। জীবনকে এই আন্দোলন নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে চায়। 'বাস্তবতা' কে বাইরের কোনো ক্রিয়া-ঘটনা রূপে না দেখে 'Inner Reality' অর্থাৎ আন্তর জগতের একটি ব্যাপার বলে মনে করতে থাকে। এর মধ্যে আছে ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা ও চরম আবেগ। বার্লিনে, ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে এই ভাবধারাকে Expressionism নাম দিয়ে থিয়েটার শুরু হয়। সুইডীশ নাট্যকার এ, ট্রিন্ডবার্গ জার্মানি লেখক ফ্র্যাংক হেবডেকাইনড-এর নাটকাবলী ১৯২০-র দশকে অভিনীত হতে থাকে। সম্পূর্ণত ১৯০০ থেকে ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মধ্য ইউরোপে এই নাট্যধারার প্রচলন ছিল। পরে সে ধারাটি আমেরিকাতে গিয়ে পৌঁছয়। ১৯১৫-১৯২৫ পর্যন্ত কালপর্বটি ছিল এই ধারার স্বর্ণযুগ। ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে নাৎসিরা ক্ষমতায় এসে এই নাট্যান্দোলনকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে।

বাংলায় এই ধারার একমাত্র নাট্যকার রবীন্দ্রনাথ। তাঁর পর আর কেউ এই ধরনের নাটক লেখেননি। উদাহরণ হিসেবে 'রক্তকরবী' এবং 'ডাকঘর' এই দুটি নাটকের উল্লেখ করা যায়। 'রক্তকরবী' নাটকে রক্তকরবী ফুল প্রাণ ও সৌন্দর্যের প্রতীক ও সংকেত রূপে গৃহীত। রক্তকরবী ফুল নন্দিনীর অঙ্গের আভরণ, কিশোর তাকে এই ফুল এনে দেয়, কিশোরের মাধ্যমেই সেই ফুলের মঞ্জরী সে রঞ্জনকে পাঠায়, এই ফুলের কঙ্কণ বিশু তুলে নেয়, সর্দারের বর্শার ফলককে নন্দিনী এই ফুলের রঙে রঙিন করে দিতে চায়, মকররাজ সেই রক্তকরবীর রক্তিম আভাটুকু ছেঁকে নিয়ে তাঁর চোখের অঞ্জন করতে চান, আবার গোকুল সেই রক্তকরবীর মধ্যেই দেখে সর্বনাশা জ্বলন্ত মশালকে, অধ্যাপকের চোখে নন্দিনীই রক্তকরবী। নন্দিনী নিজে গোধূলির রক্তিম সূর্যের মধ্যে কিংবা তা সিঁথির সিঁদুরের মধ্যে দেখে সেই রক্তকরবীকে। এইভাবে গোটা নাটকটি জুড়ে রক্তকরবী বিশেষ একটি ভাবের প্রতীক বা সংকেত হয়ে উঠেছে। যক্ষপুরীর

ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে গণবিপ্লবের সংকেত নির্দেশ করে এই নাটক শেষ হয়েছে। তেমনি 'ডাকঘর' নাটকে বাদল ও শরৎ—দুই ঋতু—দুটি ভাবের প্রতীক। শরৎ অমলকে শরতের রোদের আলোকের ক্ষেত্রে নিয়ে যাবে। বাদল অর্থাৎ বর্ষা দূরের থেকে তার কাছে আসবে। এইভাবে 'ডাকঘর' নাটকের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ এক বিশেষ ভাবনাকে তুলে ধরেছেন।

৯২.১৪ অনুশীলনী

ক) নীচের প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন ঃ

১) Expressionistic Play বলতে কী বোঝেন?

২) Symbol এবং Allegory-মধ্যে পার্থক্য কী?

৩) Symbolic গীতিকবিতা থেকে 'Symbolic নাটকে'র উদ্ভব সম্পর্কে প্রাজ্ঞ সমালোচকের মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করুন।

খ) নীচে প্রদত্ত প্রশ্নগুলির বিশদ উত্তর করুন ঃ

১) Expressionistic Play-র পরিচয় দিন।

২) একটি নাটক অবলম্বনে Expressionistic Play-র স্বরূপ প্রদর্শন করুন।

৩) Expressionistic Play-র উদ্ভবের পিছনে যে-যে দিকগুলি আছে, তার উল্লেখ করুন।

৯২.১৫ একাংক নাটক, উদাহরণ

ইংরেজিতে যাকে বলে One-Act Play, বাংলায় তাকেই বলে 'একাংক নাটক'। নাম থেকেই বোঝা যায়, এ নাটক এক অংকে সম্পূর্ণ হয়। কিন্তু এক অংকে পূর্ণ হলেই তা একাংক নাটক হয়ে উঠবে না। এর একটি নিজস্ব শিল্পরূপ আছে। পূর্ণাঙ্গ নাটক যেমন স্তরে-স্তরে, ক্রমে-ক্রমে বিকশিত হয়, একটি Climax অর্জন করে ধীরে-ধীরে উপসংহারের দিকে অগ্রসর হয়, একাংক নাটকের নাট্যরীতি ঠিক তার বিপরীত। অর্থাৎ এখানে ধীরে-ধীরে ক্রমবিকশিত হয়ে ধীরে-ধীরে স্তিমিত হয়ে পড়া নয়। একবারেই জ্বলে ওঠা,—নাট্যকাহিনীর ওই জ্বলে ওঠার অংশটিই এখানকার মূল লক্ষ্য। সে ভাবেই কাহিনীকে সাজিয়ে নিতে হয়। প্রারম্ভের সঙ্গে পরিণতির নানা প্রকার বিরোধ থাকতে পারে, সেটাই একাংক নাটকের কাহিনীগত বিবর্তন। কিন্তু একাংক নাটকের সবচেয়ে বড়ো বিশেষত্ব—পরিণতিতে বিশেষ ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করা। শিল্পরূপের দিক থেকে একাংক নাটক যেন ছোটগল্পের মতো,—ছোটগল্পের একাগ্রতা, শেষের মধ্যে ব্যঞ্জনা সৃষ্টি, অপ্রাসঙ্গিকতাকে নির্মমভাবে বর্জন—সবই এতে দেখা যায়। প্রহসন, কমেডি, ট্র্যাজেডি,—সব ধরনের বিষয়ই একাংক নাটকের বিষয় হতে পারে। এমনকি একাংক কাব্যনাট্যও হতে পারে। বিশ্বের প্রায় সব প্রখ্যাত নাট্যকারই একাংক নাটক রচনা করেছেন এবং সাফল্য লাভ করেছেন।

একাংক নাটকের উদ্ভব সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে দেখা যায়, নানা দিক থেকে নানা বিশেষত্ব এতে এসে সংহত হয়েছে। মধ্যযুগে মূল নাটক আরম্ভ হবার আগে Curtain Raiser নামে যবনিকা উত্তোলনের পূর্বে ছোটো-ছোটো নাটক অভিনয় করবার প্রথা ছিল। কিংবা মূল নাটক শেষ হয়ে গেলে After-Piece রূপে ছোট ছোট নাটক অভিনীত হতো। আবার কখনো মূল নাটকের ফাঁকে ফাঁকে Interlude নামে অন্তবর্তী নাটক, Burlesque নামে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপাত্মক নাটিকা অভিনীত হতো। এই সব

ছোট-ছোট নাটিকাগুলিই একদিন স্বয়ংসম্পূর্ণ একাংক নাটক রূপে আত্মপ্রকাশ করে। যুগ ও সময়ও একটি দিক। যেমন ছোটগল্প আধুনিক যুগেরই মানুষের সাহিত্যিক খোরাক, একাংক নাটকও যেন তাই। প্রহসন নাটকের গঠনরীতিও একাংক নাটকের উদ্ভবের পিছনে ভূমিকা নিয়ে থাকতে পারে। ভারতীয় দৃষ্টিতে বিচার করলে, 'পঞ্চরং', সঙের যাত্রা, গাজনের মেলায় প্রস্তুতিবিহীন নাটক—সবই একাংক নাটকের পরিপোষক। তবে একাংক নাটক শহরের শিক্ষিত মানুষের কাছে যতোখানি প্রিয়, গ্রামাঞ্চলে তা আদৌ নয়। আধুনিক যগে নানা প্রকার নাট্যোৎসবে এবং নাট্য প্রতিযোগিতার জন্য বহু একাংক নাটক রচিত ও মঞ্চস্থ হচ্ছে।

একাংক নাটকের বাংলা উদাহরণ ঃ বাংলায় যাঁরা একাংক নাটক রচনা করে খ্যাতি অর্জন করেছেন, তাঁদের মধ্যে নাট্যকার মন্মথ রায়ের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। একাংক নাটকের আত্ম ও শিল্পরূপটিকে তিনি বিশেষ সাফল্যের সঙ্গে অনুধাবন করতে পেরেছেন। 'রাজপুরী', 'অসাধারণ' তাঁর দুটি উল্লেখযোগ্য একাংক। এটি একটি পৌরাণিক একাংক নাটক। রানী চরিত্রের মধ্যে প্রেমের বিচিত্র রূপের প্রকাশ এবং তাই অবলম্বনে তীব্র নাটকীয়তা সৃষ্টিতে নাট্যকার বিশেষভাবে সফল। তুলসী লাহিড়ীর 'দেবী', 'চৌর্যানন্দ', বনফুলের 'শিবকাবাব', বিধায়ক ভট্টাচার্যের 'উজানযাত্রা', নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'এক সন্ধ্যায়' প্রভৃতি একাংক নাটকের সফল দৃষ্টান্ত।

৯২.১৬ সারাংশ

বিশ্বের এমন কোনো দেশ নেই, যে দেশে নাটক নেই। নাটক একটি দেশ-জাতি-সংস্কৃতির দর্পণ। প্রাচীন ভারতবর্ষে এবং গ্রিসদেশে নাট্যচর্চা বিশেষভাবে অগ্রগতি লাভ করেছিল। নাটকের উদ্ভবের পিছনে আছে নানা যাদুকর্ম ও যাদু-অনুষ্ঠান। তারপর সাধু-সন্তদের জীবনের অলৌকিক ক্রিয়া-কর্ম। ক্রমেই আনুষ্ঠানিক দিক এবং অতিলৌকিক দিককে পরিত্যাগ করে নাটক তার নিজস্ব শৈল্পিক ক্ষেত্রে এসে পৌঁছেছে। নৃত্য ও গীত চিরকাল নাটকের দুই বিশেষ দিক বলে পরিগণিত হয়ে এসেছে। প্রাচীন ভারতে নাটককে বলা হত 'দৃশ্যকাব্য'। মনের ভাবকে দৃশ্য করে তোলা। অ্যারিস্টটল নাটকের উৎস রূপে অনুকৃতিকে লক্ষ্য করেছেন। প্রাচীন ভারতে নটনটীর বদলে পুতুল নাচের মাধ্যমেই নাটক প্রদর্শিত হত বলে গবেষকগণ অনুমান করেন। রঙ্গমঞ্চ, দৃশ্যসজ্জা এবং রূপসজ্জা, আলোকপাত, ধ্বনিসৃষ্টি,—নাটকের অন্যান্য প্রয়োগগত দিক।

নাটকের নানা বিভাগ আছে ঃ ট্র্যাজেডি, কমেডি, প্রহসন। বিষয়গত দিক থেকেও নানা বিভাগ আছে। যেমন, পৌরাণিক, ঐতিহাসিক ও সামাজিক নাটক। তেমনি প্রকরণের দিক থেকে মেলে ঃ পঞ্চাংক, তিনাংক ও একাংক নাটক। আধুনিক যুগে একাংক নাটক বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে।

প্রাচীন ভারতে ট্র্যাজেডি নাটকের অস্তিত্ব ছিল না। অ্যারিস্টটল তাঁর 'Poetics' গ্রন্থে ট্র্যাজেডি নিয়ে বিশেষ আলোচনা করেছেন। চরিত্রের চেয়ে প্লটকে তিনি গুরুত্ব দিয়েছেন এবং Catharsis কে ট্র্যাজেডির শেষ লক্ষ্য বলে নির্দেশ করেছেন। Peripety, Anagnorisis, Humartia ট্র্যাজেডির এক একটি বিশেষত্বপূর্ণ উপকরণ। তেমনি Chorus-এর প্রয়োগ। গ্রিক ট্র্যাজেডির পর রোমান ট্র্যাজেডি, তারপর ইংলণ্ডে এলিজাবেথীয় যুগে শেকস্‌পীয়রীয় ট্র্যাজেডি। নিয়তির প্রভাবকে শেকস্‌পীয়র মানুষের জীবনের এক আন্তর বৈশিষ্ট্যরূপে দেখিয়েছেন, গ্রিক নাটকের মতো কোনো বাইরের শক্তিরূপে নয়। নরওয়ের হেনরিক ইবসেন নাটককে সামাজিক প্রতিবেশের মধ্যে স্থাপনা করে তাকে অধিকতর বাস্তব করে তুলেছেন। পঞ্চাংকের বদলে তিনি তিন অংকের নাটকের প্রবর্তন করেছেন।

কমেডির মূলকথা কিন্তু কেবল নায়ক-নায়িকার মিলন মাত্র নয় এর হাস্যরসের মধ্যেও আছে চিন্তার দিক। সমকালীন সমাজ এবং তার নানা বিপর্যয় কমেডির সৃষ্টির কারণ হয়েছে এবং কমেডির মধ্যেও নানা শ্রেণিভেদের সূচনা করেছে। শেকস্‌পীয়র বিশ্বের একজন শ্রেষ্ঠ কমেডিকার। এই কমেডি ধারার মধ্যেই কমেডি নাট্যশিল্প সূক্ষ্মতা অর্জন করেছে। জর্জ বার্নার্ড শ্য আধুনিক যুগে অভিনব কমেডি নাটকের সৃষ্টি করেছেন। কমেডির সঙ্গে প্রহসনের পার্থক্য আছে। রবীন্দ্রনাথ কমেডি ও ট্র্যাজেডির মধ্যে কোনো প্রকারগত পার্থক্য করেননি,—মাত্রাগত পার্থক্য করেছেন।

ভক্তিমূলক নাটক ভক্তিসর্বস্ব, পৌরাণিক নাটক কিন্তু 'নিয়মিত' (Regular) নাটক। ঐতিহাসিক নাটক ইতিহাসও বটে, খাঁটি নাটকও বটে। সামাজিক নাটকে সামাজিক চিত্র ও সমস্যার আলোচনা হয়ে থাকে। বাঙলা প্রহসন নাটকের ধারার সূচনা হয় ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে। মাইকেল এই ধারার শ্রেষ্ঠ নাট্যকার। বিংশ শতকে প্রহসন রচনার ধারা প্রায় বিলুপ্ত।

রূপক-সাংকেতিক নাট্যধারার উদ্ভব বিদেশে হলেও রবীন্দ্রনাথই বাঙলার একমাত্র এই ধারার নাট্যকার।

৯২.১৬ অনুশীলনী

ক) নীচের প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন ঃ

১) Curtain Raiser, After Piece নাটকের পরিচয় দিন।

২) Interlude ও Burlesque নাটকের পরিচয় দিন।

৩) সাধারণ নাটক ও একাংক নাটকের Climax স্থাপনের পার্থক্য কোথায়?

খ) নীচে প্রদত্ত প্রশ্নগুলির বিস্তৃত উত্তর কুরুন ঃ

১) একাংক নাটকের স্বরূপ-সংজ্ঞা সম্পর্কে আলোচনা করুন।

২) কতকগুলি বাংলা একাংক নাটকের নাম বলুন।

৩) ছোটগল্পের সঙ্গে একাংক নাটকের কোনো যোগ আছে কি না বলুন।

৯২.১৮ গ্রন্থপঞ্জি

১. সুধীরকুমার দাশগুপ্ত ঃ *কাব্যালোক।*

২. শিশিরকুমার দাশ ঃ *কাব্যতত্ত্ব অ্যারিস্টটল।*

৩. সত্যরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ *সংস্কৃত সাহিত্য সমালোচনা সংগ্রহ।*

৪. শ্রীশচন্দ্র দাশ ঃ *সাহিত্য-সন্দর্শন।*

৫. রবীন্দ্রনাথ ঃ *কৌতুকহাস্যের মাত্রা (প্রবন্ধ)।*

৬. অজিতকুমার ঘোষ ঃ *বাঙ্গালা নাটকের ইতিহাস।*

৭. সুকুমার সেন ঃ *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস।*

৮. সাধনকুমার ভট্টাচার্য, *অজিতকুমার ঘোষ ঃ একাঙ্ক সঞ্চয়ন।*

৯. কুন্তল চট্টোপাধ্যায় ঃ *সাহিত্যের রূপ-রীতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ।*

১০. J. A. Cudden : A Dictionary of Literary Terms and Literary Theory.

১১. Kalynannath Dutta : Some Aspects of the Study of Literature.

A. Nicok : Theory of Drama.

Hudson : An Introduction to the Study of Litearture.

: A Reader's Companion to world Literature.

ই. বি. জি — ৬
বাংলা বিষয়ের ঐচ্ছিক পাঠক্রম
পর্যায়
২৫

একক ৯৩ ❑ প্রবন্ধ ঃ গুরু প্রবন্ধ ও লঘু প্রবন্ধ

গঠন

৯৩.১ উদ্দেশ্য
৯৩.২ প্রস্তাবনা
৯৩.৩ মূলপাঠ - ১ প্রবন্ধের সংজ্ঞা, বৈশিষ্ট্য ও উদ্ভব
৯৩.৪ সারাংশ - ১
৯৩.৫ অনুশীলনী - ১
৯৩.৬ মূলপাঠ - ২ প্রবন্ধের শ্রেণী বিভাগ, গুরু ও লঘু প্রবন্ধের পার্থক্য ও আলোচনা
৯৩.৭ সারাংশ - ২
৯৩.৮ অনুশীলনী - ২
৯৩.৯ উত্তরমালা
৯৩.১০গ্রন্থপঞ্জি

৯৩.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করে আপনি প্রবন্ধ সাহিত্য বলতে কি বোঝায় তা আলোচনা করতে পারবেন। এই এককটি যদি আপনি যত্নসহকারে পাঠ করেন তবে অনুশীলনীর যথাযথ উত্তর দিতে পারবেন। এককটি পাঠ করলে—

- বাংলা সাহিত্যে প্রবন্ধের উৎপত্তি কিভাবে হ'ল, তা জানতে পারবেন।
- প্রবন্ধের শ্রেণীবিভাগ করতে পারবেন।
- বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন প্রাবন্ধিকের উল্লেখযোগ্য গুরু ও লঘু প্রবন্ধ সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।

৯৩.২ প্রস্তাবনা

এই এককটি পড়ে আপনি প্রবন্ধের সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য জানতে পারবেন। বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের উদ্ভব থেকে প্রথম-যুগের কিছু প্রাবন্ধিকের রচনা সম্পর্কে এই এককের প্রথম অংশে আলোচনা করাহয়েছে।

এককের দ্বিতীয় অংশে প্রবন্ধের শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছে। এই শ্রেণীবিভাগ থেকে বস্তুনিষ্ঠ বা তন্ময় (objective) ও আত্মনিষ্ঠ বা মন্ময় (subjective) প্রবন্ধের সংজ্ঞা সম্পর্কে যেমন আপনারা জানতে পারবেন, তেমনি এই দুই প্রকার প্রবন্ধের পার্থক্যও নির্ধারণ করতে পারবেন। এই প্রসঙ্গে বাংলা সাহিত্যের কিছু উল্লেখযোগ্য গুরু ও লঘু প্রবন্ধ সম্পর্কে আপনারা অবহিত হবেন।

আপনি এই এককটির দুটি পর্যায় মনোযোগ সহকারে পাঠ করুন। দুটি পর্যায় পাঠের পর আপনি অনুশীলনীর যথাযথ উত্তর দিতে পারবেন। প্রয়োজনে উত্তর সংকেত দেখুন।

৯৩.৩ মূলপাঠ - ১ প্রবন্ধের সংজ্ঞা, বৈশিষ্ট্য ও উদ্ভব

ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা সাহিত্য ক্ষেত্রে এক নতুন ধরণের সাহিত্য শাখার উদ্ভব হ'ল, যাকে আমরা বলতে পারি, প্রবন্ধ সাহিত্য। সাধারণত প্রবন্ধ গদ্যে রচিত হয়। প্রবন্ধের ভিত্তি মানুষের চিন্তা, মনন ও তত্ত্ব। তথ্য ও যুক্তির সাহায্যে মননজাত কোনো বিষয়ের প্রতিষ্ঠা দান প্রবন্ধের লক্ষ্য।

প্রবন্ধ শব্দটির প্রকৃতি-প্রত্যয়গত অর্থ হ'ল 'প্রকৃষ্ট বন্ধন'। প্রকৃষ্ট-বন্ধন যুক্ত রচনাকেই প্রবন্ধ বলা হয়ে থাকে। প্রবন্ধ সাহিত্যে সাধারণত জ্ঞান, বিজ্ঞান, ধর্ম, দর্শন, ইতিহাস, রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজ, সাহিত্য, শিল্প ইত্যাদি চিন্তামূলক ও তত্ত্বমূলক বিষয় গদ্যবাহিত হয়ে প্রকাশ পায়। এই সমস্ত লেখার পেছনে থাকে যুক্তি। কোনো চিন্তাগ্রাহ্য বিষয়কে লেখক যখন যুক্তির সাহায্যে প্রতিষ্ঠা করতে চান, তখন তা প্রবন্ধ হয়ে ওঠে।

প্রবন্ধ মূলতঃ গদ্যে লেখা হলেও পদ্যাকারে যে প্রবন্ধ লেখা যাবে না, তাও নয়। সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের "মহিলা কাব্য", সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের "আমরা", কালিদাস রায়ের "আসাম", Pope-এর "Essay on Man" ইত্যাদি কবিতার আধারে লেখা প্রবন্ধ। আবার প্রবন্ধের আকার দীর্ঘ না হলেও, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের "কৃষ্ণচরিত্র", "কমলাকান্তের দপ্তর", শরৎচন্দ্রের "নারীর মূল্য", Maill-এর "Liberty" ইত্যাদি প্রবন্ধের আয়তন বেশ দীর্ঘ।

প্রবন্ধ যেমন গদ্যে লেখা হয়, পদ্যে লেখা হয়, তেমনি প্রবন্ধের আরো নানারকম রূপ লক্ষ্য করা যায়। প্রাচীন সাহিত্যে Plato-র কথোপকথন, Pliny এবং Seneca-র পত্রাবলী, Oscar Wilde-এর "The critic as an Artist" রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "পঞ্চভূত"-এর মধ্যে প্রবন্ধের লক্ষণ বিদ্যমান।

সংস্কৃত এবং গ্রীক, লাতিন ভাষায় গদ্যরচনা অনেক কাল আগে থেকেই শুরু হয়েছিল। মধ্যযুগের ইউরোপে লাতিন ভাষায় ধর্ম-সংক্রান্ত বহু আলোচনার নিদর্শন পাওয়া যায়। রেনেসাঁসের সময়ে এবং তার কিছু পরে ইউরোপে যখন ছাপাখানার কাজ শুরু হয়ে যায়, তখন থেকে নানা সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মসংক্রান্ত আলাপ-আলোচনা, তর্ক-বিতর্ক ইত্যাদি দেশীয় ভাষাতে রচিত ও প্রচারিত হতে থাকে। এইভাবে বিশেষ বিশেষ আলোড়নকে কেন্দ্র করে ইউরোপে প্রবন্ধ রচনার সূত্রপাত ঘটে।

আমাদের দেশের সংস্কৃত পন্ডিতরা সংস্কৃত ভাষাতে নানাগ্রন্থের আলাপ-আলোচনা টীকাটিপ্পনী রচনা করেছেন। একটা সময় পর্য্যন্ত বাংলা গদ্য প্রধানত চিঠিপত্র, দলিল-দস্তাবেজ রচনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীতে এসে বাঙালীর জীবন-ইতিহাসে আমুল পরিবর্তনের সূচনা হয় এবং চিন্তামূলক গুরুতর ব্যাপারগুলো গদ্যে রচিত হতে থাকে। আর এভাবেই বাংলা সাহিত্যে গদ্য-প্রবন্ধের উৎপত্তি। ঊনবিশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে তৎকালীন সামাজিক অবস্থার প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায় সেই সময়ে সাময়িক পত্রের পৃষ্ঠায় প্রকাশিত সামাজিক রীতিনীতি ও ধর্ম-আন্দোলন সম্পর্কিত গদ্য রচনাবলীতে। শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে বাংলা সাহিত্যে চিন্তাশীল গুরু প্রবন্ধ সাহিত্যের উদ্ভব।

গুরু প্রবন্ধ সম্পর্কে আমরা কিছুটা আলোচনা করেছি, এবার আসা যেতে পারে লঘু প্রবন্ধ প্রসঙ্গে। লঘু প্রবন্ধও গদ্যে লেখা, কিন্তু তা তত্ত্ব ও তথ্যবহুল আলোচনা নয়। লঘু প্রবন্ধে রচনাকারের ব্যক্তিসত্তার

প্রতিফলন ঘটে। কোনো বিষয়কে অবলম্বনকে করে, লেখক যখন নিজের মনের কথা প্রকাশ করেন, তখন তা লঘু প্রবন্ধ সাহিত্য হয়ে ওঠে। এই ধরণের রচনা সৃষ্টির জন্য কতকগুলি জিনিষের প্রয়োজন। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, "গীতিকবিতার আত্মগতভাব, নাটকের চরমৎকারিত্ব, কাহিনীর সরসতা., রোমান্টিক সৌন্দর্য, নিস্পৃহ দার্শনিকতা, সরস কৌতুকপ্রবণতা, জগৎ, জীবন, পরিবেশ ও ব্যক্তি সম্বন্ধে উদার সহনশীল ভাব-এসব গুণ না থাকলে সার্থক রচনা সাহিত্য সৃষ্টি করা যায় না।" এ ধরণের প্রবন্ধ রম্যরচনা নামেও অভিহিত করা হয়ে থাকে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন এধরণের প্রবন্ধের মূল্য বিষয় গৌরবে নয়, রচনারসসম্ভোগে। ব্যক্তিগত প্রবন্ধ (Personal Essays) যাকে ইংরেজীতে বলা হয় Eassay Literature, তা জনক হলেন প্রসিদ্ধ ফরাসী লেখক মিচেল মঁতেঁই (Montaigne, Michel Eyguem de) । ষোড়শ শতাব্দীর শেষদিকে তিনি Essays নাম দিয়ে কতকগুলি গদ্যনিবন্ধ প্রকাশ করেন। ফরাসী ভাষায় essai শব্দের অর্থ চেষ্টা করা। মঁতেঁই Essay শব্দটিকে সাহিত্যের ক্ষেত্রে একটা নতুন ধরণের রচনারীতির সৃষ্টির চেষ্টা এই অর্থে ব্যবহার করেছিলেন। পরবর্তীকালে ইংরেজী সাহিত্যিক ল্যাম্ব, বেকন এই আদর্শের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। তারপরে অ্যাডিসন, স্টি, হ্যাজলিট, স্টিভেনসন, গোল্ডস্মিথ প্রভৃতি সাহিত্যিকদের হাতে এই ধরণের রচনাসাহিত্য চূড়ান্ত রূপ লাভ করে।

আমাদের দেশের সাহিত্যে প্রবন্ধ ও রচনা শব্দদুটি সমার্থক। ইতিহাসের দিকে তাকালেও লক্ষ্য করা যাবে, বহু জায়গায় প্রবন্ধ ও রচনাসাহিত্য অচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে আছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগ থেকে আমাদের সাহিত্যে প্রবন্ধ রচিত হতে থাকলেও, ব্যক্তিগত প্রবন্ধ বা রম্যরচনা গড়ে উঠেছে ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে। বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের লেখনীমুখে এই জাতের রচনাসাহিত্য পরমোৎকর্ষ লাভ করে।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে প্রবন্ধ-সাহিত্যের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়—

(১) প্রবন্ধসাহিত্য গদ্যে লেখা। মানুষের চিন্তা, মনন ও তত্ত্বই এখানে প্রাধান্য পেয়ে থাকে। প্রবন্ধ মস্তিষ্ক প্রসূত রচনা। তথ্য তত্ত্ব যুক্তি তর্ক সিদ্ধান্ত প্রবন্ধের প্রধান উপকরণ।

(২) সাধারণত প্রবন্ধ সাহিত্যে জ্ঞান, বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, সমাজ, রাজনীতি, সাহিত্য, ধর্ম ইত্যাদি বিষয়সমূহ প্রাধান্য পেয়ে থাকে। কোনো বিষয় সম্পর্কে লেখকের চিন্তাগ্রাহ্য তত্ত্বকে কেন্দ্র করে প্রবন্ধ গড়ে ওঠে।

(৩) প্রবন্ধ সাহিত্যের অপর ধারা ব্যক্তিগত প্রবন্ধ বা রম্যরচনা লেখকের হৃদয়জাত সৃষ্টি। রচনাকারের আবেগ কল্পনা এই ধরণের লঘু-প্রবন্ধে প্রাধান্য পেয়ে থাকে।

এবার আলোচনা করা হ'ল—বাংলাসাহিত্যে প্রবন্ধের উৎপত্তি প্রসঙ্গে। আগেই বলা হয়েছে বাংলা সাহিত্যে প্রবন্ধের উৎপত্তি হয় ঊনবিংশ শতাব্দীতে। বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের নিদর্শন গদ্য-সাহিত্যে নয়, পদ্য রচনার মধ্যেও ছড়িয়ে আছে। এই প্রসঙ্গে বৃন্দাবন দাসের "চৈতন্য-ভাগবত", কৃষ্ণদাস কবিরাজের "চৈতন্য-চরিতামৃত", উল্লেখ্য। এগুলি সাধারণত চরিত-গ্রন্থ। এই গ্রন্থগুলিতে যেমন মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের এবং তাঁর সমসাময়িক বৈষ্ণবগণের জীবনী রয়েছে, তেমনি নানা তত্ত্বলোচনাও আছে। এছাড়াও এসব গ্রন্থে এমন কিছু বাক্য আছে যেগুলিকে গদ্যে পরিবর্তিত করলে প্রবন্ধ সাহিত্যের নমুনা পাওয়া যেতে পারে। সপ্তদশ শতাব্দীতে রচিত দোম আন্তনিও-র "ব্রাহ্মণ-রোমান-ক্যাথলিকসংবাদ" গ্রন্থটি এবং অষ্টাদশ শতাব্দীতে মনোএল-দা-আসুম্প্সাম- এর লেখা "কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ" গ্রন্থদুটি যুক্তি, তথ্য, বর্ণনায় ঠাসা। এই যুগেই বিদেশী পাদরীগণের লেখা দু- একখানি 'প্রশ্নোত্তর গ্রন্থ'-র উল্লেখ পাওয়া

গেছে, যেগুলিতে বহু যুক্তি ও তথ্যের ব্যবহার করা হয়েছে, যায় ফলে এগুলিকেও আমরা প্রবন্ধ বলতে পারি।

বাংলা গদ্যসাহিত্যের প্রসারের ইতিহাস ফোর্ট-উইলিয়াম কলেজের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। এই কলেজের ছাত্রদের মধ্যে মাঝে মাঝে তর্কসভার ব্যবস্থা করা হোত এবং ছাত্ররা কোনো বিষয় সম্পর্কে নিজের বক্তব্য প্রবন্ধাকারে লিখে আনত। কলেজের ছাত্রদের এই প্রবন্ধ লেখবার চেষ্টা বাংলা রচনাসাহিত্যের ইতিহাসে খুবই উল্লেখযোগ্য। এই সকল প্রবন্ধ ছাড়া ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে যে সকল গদ্য রচিত হয়েছে, তার মধ্যেও প্রবন্ধের লক্ষণ পাওয়া যায়। রামরাম বসু-র "রাজা প্রতাপাদিত্য-চরিত" গদ্যে লেখা প্রথম জীবন চরিত। রামরাম বসুর "লিপিমালা' তেও প্রবন্ধের লক্ষণ পাওয়া যায়।

বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের ক্রমবিকাশের সঙ্গে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পন্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের নাম জড়িয়ে আছে। তাঁর "প্রবোধচন্দ্রিকা" উপদেশমূলক ও নীতিমূলক লেখার এক সঞ্চয়ন। গ্রন্থটির ভিতরে বৈজপাল বিদ্যার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তার ছেলেদের কাছে যে উপদেশ দিয়েছেন, সেগুলি নিয়ে স্বতন্ত্রভাবে একটি প্রবন্ধ রচনা করা যেতে পারে। এছাড়া তাঁর "বেদান্ত চন্দ্রিকা" ও এক উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে প্রবন্ধ সাহিত্যে পুষ্টির দিক দিয়ে কেরী সাহেবের "দিগ্‌দর্শন" পত্রিকাটি সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। এই পত্রিকাটি তৎকালীন যুবকদের জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রসারের জন্যই প্রকাশিত হোত। পত্রিকাটির মধ্যে নানা জ্ঞানগর্ভ নীতিমূলক ও কৌতুহলোদ্দীপক প্রবন্ধ প্রকাশিত হোত।

এছাড়া স্কুলবুক সোসাইটির "পশ্বাবলী" তে প্রতি সংখ্যায় একটি করে প্রকল্প প্রকাশিত হোত। তাছাড়াও "বঙ্গাদূত", "বিজ্ঞানসার সংগ্রহ", "জ্ঞানান্বেষণ" ইত্যাদি সাময়িক পত্রিকাতে, ঈশ্বর গুপ্তের 'সংবাদ প্রভাকর", মার্শম্যান-এর "সমাচার দর্পণ" ইত্যাদিও এই স্থলে স্মরণীয়। এই সকল পত্র-পত্রিকাকে অবলম্বন করে বাংলা প্রবন্ধ রচনার যে ধারাটি শুরু হয়েছিল, তার গৌরবোজ্জ্বল পরিণতি ঘটেছিল রাজেন্দ্রলাল মিত্রের "বিবিধার্থ সংগ্রহ"তে। বাংলা প্রবন্ধ রচনাকে যেভাবে সমৃদ্ধ করে গেছেন তার জন্য তিনি চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

প্রবন্ধ সাহিত্যের বিকাশে সাময়িক পত্রের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তেমনি আবার ঊনবিংশ শতাব্দীতে অনুষ্ঠিত ধর্মীয় বিবাদ-বিতর্ক এবং তৎসম্পর্কিত রচনাবলী প্রবন্ধসাহিত্যের ভিতকে পাকা করে দেয়।

বাংলাসহিত্যে প্রবন্ধ রচনার যে ধারাটি ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে শুরু হয়েছিল, তা আজও অব্যাহত। বাংলাসাহিত্যে উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ ও প্রাবন্ধিকের সংখ্যা নেহাত কম নয়। রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর থেকে শুরু করে ভূদেব মুখোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, যোগেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, রামদাস সেন, রাজকৃষ্ম মুখোপাধ্যায়, অক্ষয়চন্দ্র সরকার প্রমুখ প্রাবন্ধিক অসংখ্য প্রবন্ধ রচনা করে গেছেন এবং সেই ধারা আজও প্রবহমান।

৯৩.৪ সারাংশ-১

মধ্যযুগের ইউরোপের সামাজিক পরিস্থিতির সূত্র ধরে প্রবন্ধ রচনা শুরু হলেও ঊনবিংশ শতাব্দী থেকেই বাংলা সাহিত্যে গদ্যবাহিত প্রবন্ধের উৎপত্তি হ'ল। প্রবন্ধকে সাধারণতঃ ভাগ করা হয় দুভাগে-গুরু ও লঘু প্রবন্ধ।

প্রবন্ধ শব্দটির প্রকৃতি-প্রত্যয়গত অর্থ হ'ল 'প্রকৃষ্ট বন্ধন'। প্রকৃষ্ট বন্ধনযুক্ত রচনাই প্রবন্ধ। সাধারণত জ্ঞান, বিজ্ঞান, ধর্ম দর্শন ইতিহাস, রাজনীতি, সমাজ, সাহিত্য, শিল্প ইত্যাদি বিষয়ের চিন্তাগ্রাহ্য রূপকে লেখক যখন তথ্য ও যুক্তির সাহায্যে প্রতিষ্ঠা করতে চান, তখন তা প্রবন্ধ হয়ে ওঠে। প্রবন্ধ যেমন গদ্যে লেখা যায়, তেমনি পদ্যেও লেখা যায়। পত্রের আকারেও প্রবন্ধ রচিত হতে পারে। প্রবন্ধের আকার দীর্ঘও হতে পারে, আবার নাতিদীর্ঘও হতে পারে।

লঘু প্রবন্ধ, মন্ময় রচনা বা রম্য রচনা প্রবন্ধেরই আর এক রূপ। রম্যরচনা গদ্যে লেখা হলেও, তা তত্ত্বহুল আলোচনা নয়। লেখক যখন নিজের মনের ভাব কল্পনা রমনীয় রূপে প্রকাশ করেন, তখন তা রম্যরচনা হয়ে ওঠে। ফরাসী লেখক মিচেল মঁতেঁই ষোড়শ শতাব্দীতে এই ধরণের রচনার সূত্রপাত করেন। বাংলা সাহিত্যে ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে মন্ময় প্রবন্ধ রচনা শুরু হলেও, রবীন্দ্রনাথই এই জাতীয় সাহিত্যকে ঐশ্বর্য দান করেছেন।

মধ্যযুগে রচিত "চৈতন্য ভাগবত" বা "চৈতন্য চরিতামৃত" গ্রন্থের মধ্যে প্রবন্ধ সাহিত্যের কিছু লক্ষণ পাওয়া যায়। বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের বিকাশে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, উইলিয়াম কেরী, স্কুল বুক সোসাইটি ইত্যাদি নাম উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও "বঙ্গদূত", "বিজ্ঞানসার", "জ্ঞানান্বেষণ", "সংবাদপ্রভাকর", "সমাচার দর্পণ", "বিবিধার্থ সংগ্রহ' প্রভৃতি পত্রিকাও প্রবন্ধ সাহিত্য বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। উনিশ শতকের ধর্মকলহসূত্রে বাদানুবাদ প্রবন্ধ সাহিত্যের পুষ্টিবর্ধক।

৯৩.৫ অনুশীলনী-১

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর করুন। উত্তর শেষে উত্তরমালার সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন।

(১) প্রবন্ধের সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য লিখুন। এই প্রসঙ্গে বাংলা ও ইংরেজী কিছু প্রবন্ধের নাম লিখুন।

(২) গদ্য রচিত প্রবন্ধকে কটি ভাগে ভাগ করা যায় তা উল্লেখ করে, সেগুলি সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করুন।

(৩) বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের উৎপত্তি ও বিকাশের ধারা বর্ণনা করুন।

(৪) প্রবন্ধসাহিত্যের গুরু ও লঘুর মধ্যে কোন ভেদ আছে কি? থাকলে তা স্পষ্ট করে বুঝিয়ে লিখুন।

(৫) শূন্যস্থান পূরণ করুন ঃ

(ক) প্রবন্ধ শব্দটির প্রকৃতি-প্রত্যয়গত অর্থ হ'ল—— ——।

(খ) এই গদ্যবাহিত রচনাকে —— ও —— এই —— ভাগ করা যায়।

(গ) —— যাকে ইংরেজীতে বলা হয় —— ——, তার জনক হলেন প্রসিদ্ধ—— লেখক —— ——।

(ঘ) বাংলাসাহিত্যে —— —— ই —— ঐশ্বর্য দান করলেন।

(ঙ) রামরাম বসুর —— —— —— গদ্যে লেখা প্রথম —— ——।

৬। সঠিক উত্তরে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

(ক) বাংলা সাহিত্যে প্রবন্ধের উৎপত্তি (১) ঊনবিংশ শতাব্দীতে, (২) ষোড়শ শতাব্দীতে, (৩) মধ্যযুগে

(খ) মন্ময় প্রবন্ধ সাহিত্যের জনক (১) বেকন (২) মিচেল মঁতেঁই, (৩) হ্যাজলিট

(গ) "কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ"-এর রচয়িতা- (১) দোম আন্তনিও, (২) মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, (৩) মনোএল-দা-আসুম্‌প্‌সাম।

(ঘ) "বিবিধার্থ সংগ্রহ" পত্রিকাটির সম্পাদক- (১) রাজেন্দ্রলাল মিত্র (২) স্কুল বুক সোসাইটি (৩) ঈশ্বরগুপ্ত।

৯৩.৬ মূলপাঠ- ২ প্রবন্ধের শ্রেণীবিভাগ, গুরু ও লঘু প্রবন্ধের পার্থক্য ও আলোচনা

সাহিত্যের যা উদ্দেশ্য, অর্থাৎ সৌন্দর্য সৃষ্টি ও আনন্দদান, প্রবন্ধসাহিত্যের লক্ষণও তদনুরূপ। প্রবন্ধকে দুভাগে ভাগ করা হয়,— (১) বস্তুনিষ্ঠ বা তন্ময় বা গুরু প্রবন্ধ ও (২) মন্ময় বা ব্যক্তিগত বা লঘু প্রবন্ধ। নীচে এই দুইপ্রকার প্রবন্ধ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করা হ'ল।

(১) বস্তুনিষ্ঠ বা তন্ময় বা গুরু প্রবন্ধ (Formal or Informative Essay)- এই শ্রেণীর প্রবন্ধ কোনো প্রাবন্ধিকের বিষয়জ্ঞান ও তার যুক্তিনিষ্ঠ উপস্থাপনা গুরুপ্রবন্ধে প্রাধান্য পায়। প্রকৃষ্টবন্ধনে আবদ্ধ এই জাতীয় প্রবন্ধকে "বিষয়-গৌরবী" প্রবন্ধও বলা হয়।

(২) ব্যক্তিগত বা মন্ময় বা লঘু প্রবন্ধ (Familiar বা Intimate Essay)-এখানে লেখকের চিন্তার চেয়ে ব্যক্তি-হৃদয়ই প্রধান। কখনো খুব পুরোনো কখনো বা পরিচিত বিষয়কে প্রাবন্ধিক এখানে নিজের কল্পনার দ্বারা রঞ্জিত করে প্রকাশ করেন। অন্তর্লীন সঙ্গতির সূত্র বজায় রেখে বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে গমনাগমনের স্বাধীনতা থাকে লেখকের। বিষয়ের থেকে প্রকাশ ভঙ্গির বৈশিষ্ট্য আকর্ষণ করে পাঠককে। এই জাতীয় প্রবন্ধকে আমরা "আত্মগৌরবী" প্রবন্ধও বলতে পারি। রচনার রস্যতাদৃষ্টে রম্যরচনা বলেও অভিহিত হয়ে থাকে এ জাতীয় প্রবন্ধ।

উপরের আলোচনা থেকে এই দুই জাতীয় প্রবন্ধের কিছু পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়—

(১) গুরু প্রবন্ধ আমাদের বুদ্ধিকে তীক্ষ্ণতর, দৃষ্টিকে সমুজ্জ্বল, জ্ঞানের পরিধিকে প্রশস্ত করে তোলে। আর লঘু প্রবন্ধ হালকা চালে বিষয়কে রমণীয় করে তোলে।

(২) গুরু প্রবন্ধ নানা প্রশ্নের মধ্যে দিয়ে জীবনের নানা সমস্যার সমাধান করতে পারে, লঘু প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক গম্ভীর বিষয়কে স্নিগ্ধ করে পাঠকের চারিদিকে একটি সুন্দর ভাবমণ্ডল সৃষ্টি করেন।

(৩) বস্তুনিষ্ঠ বা গুরু প্রবন্ধে লেখকের বিচার-বুদ্ধি, চিন্তা ইত্যাদি প্রধান, আর ব্যক্তিগত বা লঘু প্রবন্ধে লেখকের রসময় মধুর আত্ম-স্পর্শ প্রধান।

(৪) বস্তুনিষ্ঠ প্রবন্ধে লেখক যদি আত্মপ্রচার করেন ব্যক্তিগত প্রবন্ধে লেখক করেন আত্ম-নিবেদন।

(৫) বস্তুনিষ্ঠ বা গুরু প্রবন্ধের বিষয়বস্তু জ্ঞানগর্ভ, গুরুগম্ভীর, কিন্তু সংসারের যে কোনো বিষয়, তা যতো তুচ্ছাতিতুচ্ছ হোক না কেন লঘু প্রবন্ধের বিষয়ীভূত হতে পারে।

এবার আমরা বাংলা সাহিত্যের কিছু উল্লেখযোগ্য গুরু ও লঘু প্রবন্ধ সম্পর্কে আলোচনা করব।

প্রথমে আসা যাক গুরু প্রবন্ধের কথায়। এখানে উল্লেখযোগ্য কিছু প্রবন্ধের আলোচনা যেমন করা হবে, তেমনি সেই সব প্রবন্ধের রচয়িতাদের সম্পর্কেও সংক্ষিপ্ত আলোচনা থাকবে। বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্যের প্রথম যুগের রচনাকারদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন রাজা রামমোহন রায়। তিনিই বাংলা গদ্যকে প্রথম বিতর্ক ও বাদ প্রতিবাদের বাহন করে তুললেন। তাঁর "বেদান্ত গ্রন্থ" (১৮১৫), "বেদান্ত সার" (১৮১৫), "উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশের সহিত বিচার" (১৮১৮), "গোস্বামীর সহিত বিচার" (১৮১৮), "সহমরণ বিষয়ক প্রবর্তক-নিবর্তক সম্বাদ" (১৮১৮-১৯) ইত্যাদি গ্রন্থগুলি সবই গুরুগম্ভীর ও অনেকক্ষেত্রেই বিতর্কমূলক।

এর পরবর্তী উল্লেখযোগ্য গুরু প্রবন্ধ রচয়িতা হলেন অক্ষয়কুমার দত্ত। তিনি ছিলেন চিন্তাশীল পণ্ডিত। তাঁর জ্ঞানের পরিধি ছিল বিস্তৃত। তাই দেশ-বিদেশের জ্ঞান-বিজ্ঞান থেকে তথ্য আহরণ করে তিনি তাঁর গ্রন্থের মধ্যে প্রকাশ করেছেন। তাঁর "ভূগোল" (১৮৪১), "চারুপাঠ" (১৮৫৩-৫৯), "বাহ্য বস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধবিচার" (১৮৫১ প্রবন্ধ খণ্ড, ১৮৫৩ ২-য় খণ্ড) ইত্যাদি এই জাতীয় জ্ঞানগর্ভ রচনা। এই গ্রন্থগুলির মধ্যে তাঁর যুক্তিশীল মনন ও চিন্তার পরিচয় পাওয়া যায়।

আমাদের আলোচিত পরবর্তী গুরু প্রবন্ধগুলি হ'ল "সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য শাস্ত্রবিষয়ক প্রস্তাব" (১৮৫৩), "বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব" (১৮৫৫), "বহু বিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক বিচার" (১৮৭১-১ম, ১৮৭৩-২য়) ইত্যাদি প্রবন্ধগুলি। এগুলি সবই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের লেখা। এই প্রবন্ধগুলির সবগুলিতেই যুক্তি ও তথ্যের সমারোহ লক্ষ্য করা যায়।

বিদ্যাসাগরের পরবর্তীকালে গুরু প্রবন্ধ রচয়িতাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন ভুদেব মুখোপাধ্যায়। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য গুরু প্রবন্ধ হ'ল "বিবিধ প্রবন্ধ" (১৮৯৫-১ম, ১৯০৫-২য় খণ্ড)। এই প্রবন্ধটিতে সংস্কৃত সাহিত্য সম্বন্ধে সমালোচনার মধ্যে দিয়ে প্রাবন্ধিকের সাহিত্যবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। গ্রন্থটির মধ্যে সংস্কৃত সাহিত্যের নিপুণ, বিশ্লেষণমূলক ও সুদীর্ঘ পরিচয় পাওয়া যায়। এছাড়া তাঁর উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ হ'ল "পারিবারিক প্রবন্ধ" (১৮৮২), "সামাজিক প্রবন্ধ (১৮৯২), এবং "আমার প্রবন্ধ (১৮৯২)। এই রচনাগুলি সবই গভীর চিন্তামূলক। ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজের পারস্পরিক সম্বন্ধ এবং পরিবার ও সমাজের প্রতি ব্যক্তির কর্তব্য অত্যন্ত সংযত ভাষায় এখানে লিপিবদ্ধ হয়েছে।

এরপরে উল্লেখযোগ্য, প্রবন্ধ সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচয়িতা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ। গুরু ও লঘু উভয় জাতীয় প্রবন্ধ রচনায় তিনি তাঁর কৃতিত্বের সাক্ষর রেখেছেন। গুরু প্রবন্ধের ক্ষেত্রে মোটামুটি সব রকম বিষয় অবলম্বন করে প্রবন্ধ রচনা করে তিনি বাঙালীকে প্রবুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। সাহিত্য, ইতিহাস, সমাজ, ধর্ম, শিল্প, শাস্ত্র সবরকম বিষয়েই তাঁর প্রবন্ধ পাওয়া যায়। "বিজ্ঞানরহস্য" (১৮৭৫) প্রবন্ধের মধ্যে তিনি বৈজ্ঞানিক তথ্যের সমাবেশ ঘটিয়েছেন। "বিবিধ প্রবন্ধ" (১৮৮৭-১ম, ১৮৯২-২য় খণ্ড) তে সাহিত্য, ইতিহাস, সমাজ ইত্যাদি বিষয়ে প্রবন্ধ সংকলিত হয়েছে। ১৮৮৮ খ্রীস্টাব্দে লেখা "ধর্মতত্ত্ব"তে ধর্মজিজ্ঞাসার নানা আলোচনা পাওয়া যায়। এছাড়া তাঁর অন্যান্য উল্লেখযোগ্য গুরু প্রবন্ধ হ'ল "সাম্য" (১৮৭৯), "বিবিধ সমালোচনা" (১৮৭৬), "প্রবন্ধপুস্তক" (১৮৭৯), "কৃষ্ণচরিত্র" ইত্যাদি। এই প্রবন্ধগুলিতে যুক্তি, তথ্য মননের নানা পরিচয় পাওয়া গেলেও তা কখনই নীরস আলোচনা হয়ে ওঠেনি। বলা যেতে পারে বুদ্ধিপ্রধান বিশুদ্ধ রচনায় বঙ্কিমচন্দ্রের কৃতিত্ব অসাধারণ।

বঙ্কিমচন্দ্রের সমকালের এবং পরবর্তী সময়ের কিছু প্রবন্ধিক, যাঁদের বঙ্কিম অনুসারী বলা যায়, তাঁরা কিছু উল্লেখযোগ্য গুরু প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের "গ্রীক ও হিন্দু" (১৮৭৫), "বাল্মীকি ও তৎসমসাময়িক বৃত্তান্ত" (১৮৭৬), যোগেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাভূষণের "ম্যাটসিনির জীবনবৃত্ত" (১৮৮০), "গ্যারিবল্ডীর জীবনবৃত্ত (১৮৯০), "বীরপূজা" (১৯০০), রামদাস সেনের "ঐতিহাসিক রহস্য" (১৮৭৪-১ম, ১৮৭৬-২য়, ১৮৭৯-৩য়), "ভারতরহস্য" (১৮৮৫) ইত্যাদি। এই প্রবন্ধগুলিতে রাজনীতি, ইতিহাস, পুনরাবৃত্ত ইত্যাদি বিষয় আলোচিত হয়েছে। এই সময়কার আরো কিছু উল্লেখনীয় গুরু প্রবন্ধ হ'ল "সমাজ সমালোচনা" (১৮৭৫), "আলোচনা" (১৮৮২), "রূপক ও রহস্য"- অভয়চন্দ্র সরকার রচিত, "প্রভাতচিন্তা" (১৮৮৪), "নিভৃতচিন্তা" (১৮৮৩), 'নিশীথচিন্তা" (১৮৯৬)- কালীপ্রসন্ন ঘোষ রচিত, "নানাপ্রবন্ধ" (১৮৮৫)- রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় রচিত ইত্যাদি।

তখনকার সময়ের আরো তিনজন উল্লেখযোগ্য প্রাবন্ধিক হলেন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশবচন্দ্র সেন, স্বামী বিবেকানন্দ। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের "তত্ত্ব বিদ্যা" (১৮৬৬০৬৯), "নানা চিন্তা" (১৯২০), "প্রবন্ধমালা' (১৯২০) ইত্যাদি প্রবন্ধে দর্শনচিন্তার পরিচয় পাওয়া যায়। কেশবচন্দ্র সেনের ভক্তিবাদ, অধ্যাত্মানুভূতি তাঁর "জীবনবেদ" গ্রন্থের মধ্যে পাওয়া যায়। স্বামী বিবেকানন্দের অধিকাংশ রচনাই ইংরেজীতে লেখা হলেও, বাংলায় তিনি কিছু গুরু-গম্ভীর প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন। যেমন—"ভাববার কথা", "পরিব্রাজক", "প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য" ইত্যাদি। এবার আমরা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কিছু উল্লেখযোগ্য গুরু প্রবন্ধ নিয়ে আলোচনা করব। রাজনীতি, সমাজনীতি, শিক্ষা, ধর্ম, দর্শন ইত্যাদি নানা বিয়য়ে তিনি গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ রচনা করেছেন। এইসব বিষয়ে তিনি কতটা গভীরভাবে চিন্তা করতেন, তা তাঁর রচিত এইসব বিষয়ের ওপর লেখা প্রবন্ধগুলি লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে। "ভারতবর্ষ" (১৯০৬), "রাজাপ্রজা" (১৯০৮), "স্বদেশ" (১৯০৮), "পরিচয়" (১৯১৬), "সভ্যতার সংকট" (১৯৪১) ইত্যাদি প্রবন্ধে তিনি রাজনীতি, সমাজনীতি বিষয়ে আলোচনা করেছেন। সবজায়গায় তিনি মানবধর্মকে জয়যুক্ত দেখতে চেয়েছেন। শিক্ষা বিষয়ক তাঁর উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ হ'ল "শিক্ষা" (১৯০৮)। এই প্রবন্ধে তিনি আমাদের দেশের শিক্ষাসমস্যা, পাশ্চাত্য শিক্ষাদীক্ষার সঙ্গে তুলনায় প্রাচ্যশিক্ষার বিশিষ্টতা মাতৃভাষাপ্রীতি ইত্যাদি বিষয়ে গুরুগম্ভীর আলোচনা করেছেন। "ধর্ম" (১৯০৯), "শান্তিনিকেতন" (১৯০৯-১৬), "মানুষের ধর্ম" (১৯৩৩) ইত্যাদি প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের ধর্ম বিষয়ক নানা চিন্তা-ভাবনার পরিচয় পাওয়া যায়। উপরিউক্ত প্রবন্ধগুলিতে তাঁর অসাধারণ মনীষা, পাণ্ডিত্য, যুক্তি প্রকাশিত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পর বাংলা সাহিত্যে বস্তুনিষ্ঠ বা গুরু প্রবন্ধ আমরা অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনাতে পাই। তাঁর এই জাতীয় একটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ হ'ল "বাগেশ্বরী শিল্পপ্রবন্ধাবলী" (১৯৪৯)। শশিভূষণ দাশগুপ্তের মতে "বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী" শুধু প্রবন্ধ গুণসমন্বিত নহে,—যথেষ্ট রচনাগুণ সমন্বিত। প্রবন্ধটির মধ্যে শিল্প-সম্পর্কিত নানা আলোচনার মধ্যে দিয়ে তাঁর শিল্পীমনেরই পরিচয় পাওয়া যায়।

এবার আমাদের আলোচনা লঘু প্রবন্ধ নিয়ে। লঘু বা মন্ময় প্রবন্ধ আলোচনায় আমাদের সবচেয়ে প্রথমেই মনে পড়ে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের "অতি অল্প হইল" (১৮৭৩), "আবার অতি অল্প হইল" (১৮৭৩), এবং "ব্রজবিলাস" (১৮৮৪) এই তিনটি প্রবন্ধের কথা। বিধবাবিবাহ প্রচলন এবং বহুবিবাহ নিরোধ করবার জন্য বিদ্যাসাগরের বিপক্ষে যে কুৎসা রটনা করা হয়েছিল, তার প্রতিবাদ করার জন্য বিদ্যাসাগর "কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপো সহচরস্য" এই ছদ্মনামে বিদ্রুপকৌতুক লঘুরসের মধ্যে দিয়ে উপরিউক্ত বিতর্কমূলক রচনাগুলি লিখেছেন। বন্ধুকন্যার মৃত্যু উপলক্ষে লেখেন শোকাঞ্জলি "প্রভাবতী সম্ভাষণ।"

এবার আমাদের আলোচ্য প্রবন্ধ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের "লোকরহস্য" (১৮৭৪)। প্রবন্ধটির মধ্যে সমাজ, শিক্ষা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে এবং এসব আলোচনাই কৌতুকরসের আধারে পরিবেশিত হয়েছে।

এরপরে বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগত বা লঘু প্রবন্ধের আলোচনায় আসা যেতে পারে। এটি হ'ল বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের "কমলাকান্তের দপ্তর" (১৮৫৭)। প্রবন্ধটি কৌতুক পরিহাসে ভরা। ইংরেজ সাহিত্যিক ও সমালোচক ডি কুইন্সির "Confessions of an English Opium Eater"-এর কথা স্মরণে রেখে রচিত হয়েছিল এই গ্রন্থ। এর মধ্যে একদিকে যেমন গল্পরস আছে, নাটকীয়তা আছে, অন্যদিকে রচনাসাহিত্যের ব্যক্তিগত লক্ষণও রয়েছে। সব মিলিয়ে "কমলাকান্তের দপ্তর" বাংলা সাহিত্যের এক উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হয়ে উঠেছে। সমাজ, স্বদেশ, সাহিত্য ইত্যাদি বিষয়ের নানা সমস্যা

নিয়ে প্রাবন্ধিক এখানে আলোচনা করেছেন। গ্রন্থটি তিনটি অংশে বিভক্ত-কমলাকান্তের দপ্তর, কমলাকান্তের পত্র ও কমলাকান্তের জোবানবন্দী। এই তিনটি অংশের মধ্যে দিয়ে হাস্যরসাত্মক নানাধরনের রচনা লিপিবদ্ধ হয়েছে। যেমন প্রথম অংশের প্রথম সংখ্যা "একা-কে গায় ওই"। এই অংশ কোনো তথ্য সংবাদ বহন না করলেও তা উপাদেয় সাহিত্য। এই অংশের আরো কয়েকটি উল্লেখ্য সংখ্যা হ'ল-"বিড়াল", "পতঙ্গ", "আমার মন", "বড় বাজার", "আমার দুর্গোৎসব", "বসন্তের কোকিল" ইত্যাদি। প্রবন্ধের ভিতরে আফিংখোর কমলাকান্ত চক্রবর্তীর মুখ দিয়ে সে সব কথা বেরিয়েছে, তা যে সবই বঙ্কিমচন্দ্রের নিজস্ব কথা, সে কথা বুঝতে পাঠকের কোনো কষ্ট হয় না। এর থেকে বোঝা যায় বঙ্কিমের ভিতরে একটি কবি-প্রাণ ছিল, দার্শনিক মনোভাব ছিল, স্বদেশের প্রতি ভক্তি ছিল, সর্বোপরি একটি হাস্যরসিক হৃদয় ছিল এবং সত্তার এই সমস্ত অংশ একসঙ্গে মিশে "কমলাকান্তের দপ্তর" সৃষ্টি করেছিল।

ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় হাস্যরস অবলম্বন করে কয়েকটি প্রবন্ধ রচনা করেছিলন। সেগুলি হোল—"হিন্দু জাতির একনিষ্ঠতা" (বঙ্গদর্শন, ১৩০৮), "পিঠে পুলি" ইত্যাদি।

এরপরে উল্লেখযোগ্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত ব্যক্তিগত প্রবন্ধ "পঞ্চভূত"। এটি প্রকাশিত হয় ১৮৯৭খ্রীস্টাব্দে। "পঞ্চভূত"কে মানুষ বানিয়ে তাদের মুখনিঃসৃত বিতর্কের মধ্যে দিয়ে প্রচুর কৌতুকরসের আমদানি করে সাহিত্য, শিল্প সম্পর্কে প্রচুর গুরু কথাকে কবি লঘুভাবে এখানে প্রকাশ করেছেন। তাঁর "বিচিত্র প্রবন্ধ" (১৯০৭)-ও ব্যক্তিগত প্রবন্ধের পর্যায়ভুক্ত। বিচিত্র প্রবন্ধের ভূমিকাতেই লঘুপ্রবন্ধের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করে কবি মন্তব্য করেছিলেন, বিষয়বস্তুর গৌরব নয়, এ ধরনের লেখায় মূল উপভোগ্য হ'ল রচনার সরসতা।

রবীন্দ্রনাথের সমকালে প্রমথ চৌধুরী কয়েকটি লঘু প্রবন্ধ লিখেছিলেন, যেমন-"বীরবলের হালখাতা" (১৯১৭), "তেল-নুন-লকড়ী" (১৯০৬)। ব্যঙ্গবিদ্রুপের সাহায্যে আমাদের জড়তাগ্রস্ত সমাজের স্থবিরতাকে তিনি নাস্তানাবুদ করেছেন।

আধুনিক যুগেও অনেক লেখক ব্যক্তিগত প্রবন্ধ রচনা করেছেন। এর মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য বুদ্ধদেব বসুর "হঠাৎ আলোর ঝলকানি"। এছাড়াও বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, "যাযাবর", মুজতবা আলি প্রমুখ জীবনের নানা অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার থেকে রস আহরণ করে ব্যক্তিগত প্রবন্ধ রচনা করেছেন।

পরিশেষে একটি কথা বলা প্রয়োজন। ইংরেজি ভাষায় লেখা সাহিত্য, ইতিহাস, সমাজ, অর্থনীতি ইত্যাদি বিষয়ের ওপর যেমন গুরু গম্ভীর প্রবন্ধ অনেক আছে, তেমনি এইসব বিষয় নিয়ে বাংলাতেও কম প্রবন্ধ নেই। কিন্তু বাংলা সাহিত্যে ব্যক্তিগত বা লঘু জাতীয় প্রবন্ধের পরিমাণ তুলনামূলক ভাবে কম।

৯৩.৭ সারাংশ-২

বিষয়বস্তুর দিক থেকে প্রবন্ধ সাহিত্যকে দুভাগে ভাগ করা হয়। (১) বস্তুনিষ্ঠ বা তন্ময় বা গুরু প্রবন্ধ এবং (২) ব্যক্তিগত বা মন্ময় বা লঘু প্রবন্ধ।

বস্তুনিষ্ঠ প্রবন্ধে একটা সুনির্দিষ্ট আয়তনে প্রাবন্ধিক তাঁর জ্ঞান, পাণ্ডিত্যের প্রকাশ ঘটিয়ে আমাদের মুগ্ধ করে রাখেন। আর ব্যক্তিগত প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক পরিচিত বিষয়কেই নিজের কল্পনার সাহায্যে নতুন করে প্রকাশ করেন। অর্থাৎ গুরু প্রবন্ধ আমাদের জ্ঞান, বুদ্ধি, দৃষ্টিকে প্রশস্ত, তীক্ষ্ম ও সমুজ্জল করে তোলে। আর লঘু প্রবন্ধ সাধারণ বিষয়কেই রচনাবৈশিষ্ট্যে অসাধারণ করে ফুটিয়ে তোলে।

বাংলা সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য গুরু প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন রাজা রামমোহন রায়, অক্ষয়কুমার দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, যোগেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, রামদাস সেন, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, কালীপ্রসন্ন ঘোষ, রাজকৃষ্ম মুখোপাধ্যায়, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বামী বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ লেখকবৃন্দ। বাংলাসাহিত্যে গুরু প্রবন্ধ অনেক রচনা হলেও, লঘু প্রবন্ধের সংখ্যা বাংলাসাহিত্যে সেই তুলনায় কম। আর এই লঘু বা ব্যক্তিগত প্রবন্ধের উল্লেখযোগ্য রচয়িতারা হলেন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রমথ চৌধুরী প্রভৃতি লেখক।

৯৩.৮ অনুশীলনী-২

নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর করুন। উত্তর শেষে উত্তরমালার সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন।

(১) গুরু ও লঘু প্রবন্ধের পার্থক্য নির্দেশ করুন এবং এই প্রসঙ্গে দুটি করে গুরু ও লঘু প্রবন্ধের ও তাদের রচনাকারদের নাম করুন।

(২) প্রবন্ধকে কটি ভাগে ভাগ করা যায় ও কি কি তা উল্লেখ করে তাদের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করুন।

(৩) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের রচিত গুরু ও লঘু প্রবন্ধ সম্পর্কে যা জানেন লিখুন।

(৪) শূন্যস্থান পূরণ করুন ঃ

(ক) বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের —— যুগের রচনাকারদের মধ্যে —— হলেন — —ার।

(খ) —— প্রবন্ধের মধ্যে তিনি বৈজ্ঞানিক তথ্যের সমাবেশ ঘটিয়েছেন।

(গ) কেশবচন্দ্র সেনের——, অধ্যাত্মনুভূতি তাঁর —— গ্রন্থের মধ্যে পাওয়া যায়।

(ঘ) —— বিষয়ক তাঁর উল্লেখযোগ্য —— হ'ল ——।

(ঙ) সব মিলিয়ে —— —— বাংলা সাহিত্যের এক উল্লেখযোগ্য —— হয়ে উঠেছে।

৫। সঠিক উত্তরে ঠিক (√) চিহ্ন দিন ঃ

(ক) বিষয়- গৌরবী প্রবন্ধ হ'ল- (১) তন্ময় প্রবন্ধ, (২) মন্ময় প্রবন্ধ, (৩) ব্যক্তিগত প্রবন্ধ।

(খ) 'ভূগোল' গ্রন্থটির রচয়িতা - (১) অক্ষয়কুমার দত্ত, (২) বিদ্যাসাগর, (৩) বঙ্কিমচন্দ্র।

(গ) 'ধর্মতত্ত্ব' গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়- (১) ১৮৮৬, (২) ১৮৮৮, (৩) ১৮৮০।

(ঘ) 'নানা প্রবন্ধ' রচনা করেছিলেন- (১) ভূদেব মুখোপাধ্যায়, (২) রাজকৃষ্ম মুখোপাধ্যায়, (৩) কালীপ্রসন্ন ঘোষ।

(ঙ) অবনীন্দ্র নাথ ঠাকুর রচিত বিখ্যাত গ্রন্থ-(১) ধর্ম, (২) বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী, (৩) রাজা প্রজা।

(চ) 'লোকরহস্য গ্রন্থের রচয়িতা - (১) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, (২) প্রমথ চৌধুরী, (৩) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

(ছ) ১৮৭৫ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত হয়- (১) কমলাকান্তের দপ্তর, (২) ব্রজবিলাস, (৩) সাম্য।

৯৩.৯ উত্তরমালা

অনুশীলনী- ১

১-৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তরের জন্য মূলপাঠ-১ এর প্রাসঙ্গিক অনুচ্ছেদগুলি ভালো করে পড়ুন। তাহলেই উত্তর করতে পারবেন।

(৫) (ক) প্রকৃষ্ট, বন্ধন।
(খ) প্রবন্ধ সাহিত্য, রচনা সাহিত্য, দুভাগে।
(গ) রচনা সাহিত্য, Essay, Literature, ফরাসী মিচেল মঁতেই।
(ঘ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রচনাসাহিত্যকে।
(ঙ) রাজা প্রতাপাদিত্য, চরিত্র, জীবন-চরিত।

৬। (ক) ঊনবিংশ শতাব্দীতে
(খ) মিচেল মঁতেই
(গ) মনোএল-দা-আসুম্প্সাম
(ঘ) রাজেন্দ্রলাল মিত্র

অনুশীলনী-২

১-৩ নম্বর প্রশ্নের উত্তরের জন্য মূলপাঠ-২-এর প্রাসঙ্গিক অনুচ্ছেদগুলি ভালো করে পড়ুন। তাহলেই উত্তর করতে পারবেন।

(৪) (ক) প্রথম, উল্লেখযোগ্য, রাজা, রামমোহন
(খ) বিজ্ঞানরহস্য
(গ) ভক্তিবাদ, জীবনবেদে
(ঘ) শিক্ষা, প্রবন্ধ, শিক্ষা
(ঙ) কমলাকান্তের দপ্তর, গ্রন্থ

৫। (ক) তন্ময় প্রবন্ধ
(খ) অক্ষয়কুমার দত্ত
(গ) ১৮৮৮
(ঘ) রাজকৃষ্ম মুখোপাধ্যায়
(ঙ) বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী
(চ) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
(ছ) কমলাকান্তের দপ্তর

৯৩.১০ গ্রন্থপঞ্জি

(১) শশীভূষণ দাশগুপ্ত— বাংলা সাহিত্যের একদিক
(২) শ্রীশচন্দ্র দাশ— সাহিত্য সন্দর্শন
(৩) অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়— বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত।

একক ৯৪ ❑ কথাসাহিত্য ঃ উপন্যাস, সামাজিক উপন্যাস ঐতিহাসিক উপন্যাস

গঠন

৯৪.১ উদ্দেশ্য
৯৪.২ প্রস্তাবনা
৯৪.৩ মূলপাঠ- ১-কথাসাহিত্য ঃ উপন্যাস
৯৪.৪ সারাংশ- ১
৯৪.৫ অনুশীলনী - ১
৯৪.৬ মূলপাঠ - ২ সামাজিক উপন্যাসের সংজ্ঞা ও বিকাশের ধারা
৯৪.৭ সারাংশ - ২
৯৪.৮ অনুশীলনী - ২
৯৪.৯ মূলপাঠ - ৩-ঐতিহাসিক উপন্যাসের সংজ্ঞা ও বিকাশের ধারা
৯৪.১০ সারাংশ - ৩
৯৪.১১ অনুশীলনী - ৩
৯৪.১২ উত্তরমালা
৯৪.১৩ গ্রন্থপঞ্জি

৯৪.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে আপনি কথাসাহিত্যের একটি বিভাগ উপন্যাস সম্পর্কে যেমন জানতে পারবেন, তেমনি উপন্যাসের প্রধান দুটি বিভাগ সামাজিক উপন্যাস ও ঐতিহাসিক উপন্যাস সম্পর্কেও আলোচনা করতে পারবেন।

আপনি এককটি যত্নসহকারে পাঠ করুন এবং অনুশীলনীর যথাযথ উত্তর দিতে চেষ্টা করুন। এই এককটি থেকে আপনি-

- পাশ্চাত্য উপন্যাসের উদ্ভব কিভাবে হ'ল তা জানতে পারবেন।
- বাংলা উপন্যাসের উদ্ভব কিভাবে হ'ল, সে সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।
- বাংলা সাহিত্যের প্রথম যথার্থ উপন্যাস কি এবং কেন সেটিকে প্রথম যথার্থ উপন্যাস বলা হয়, সে সম্পর্কে ধারণা পাবেন।
- এছাড়াও ইতিহাসের দিক দিয়ে বাংলা সাহিত্যের প্রথম উপন্যাস কি এবং কেন সেটি প্রথম উপন্যাসের মর্যাদা পায়নি, তাও জানতে পারবেন।

- সামাজিক ও ঐতিহাসিক উপন্যাসের উদ্ভব সম্পর্কে ধারণা পাবেন।
- উপন্যাসের এই দুটি শাখার অন্তর্গত বিভিন্ন ঔপন্যাসিকদের উপন্যাসগুলি নিয়ে আলোচনা করতে পারবেন।

৯৪.২ প্রস্তাবনা

এই এককটি পড়ে আপনি কথাসাহিত্যের একটি বিভাগ উপন্যাস সম্পর্কে জানতে পারবেন এবং উপন্যাস সৃষ্টির মূলে কথাসাহিত্যের অপর বিভাগ গল্পেরও যে কিছু অবদান আছে, সে সম্পর্কেও অবগত হবেন। এছাড়া পাশ্চাত্য উপন্যাস এবং বাংলা উপন্যাসের উদ্ভব কিভাবে হ'ল, তার আলোচনা এই এককটিতে করা হয়েছে। এছাড়া বাংলা সাহিত্যের প্রথম যথার্থ উপন্যাস এবং ইতিহাসের ভিত্তিতে বাংলা সাহিত্যের প্রথম যথার্থ উপন্যাস কোনটি, তার আলোচনাওএ এককটিতে আছে। আপনি এককটি ভালোভাবে পাঠ করলে পাশ্চাত্য ও আমাদের দেশে উপন্যাসের উদ্ভব কিভাবে হ'ল, সে সম্পর্কে একটা ধারনা পাবেন।

এককটির দ্বিতীয় ভাগে সামাজিক উপন্যাস সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে সামাজিক উপন্যাসের সংজ্ঞা ও উদ্ভব সম্পর্কে প্রথমে আলোচনা করা হয়েছে, তারপরে সামাজিক উপন্যাসের রচয়িতার নাম এবং তাঁদের উল্লেখযোগ্য কিছু উপন্যাস সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এককটির তৃতীয় ভাগে ঐতিহাসিক উপন্যাসের সংজ্ঞা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়া এখানে, ঐতিহাসিক উপন্যাসকে যে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়, তার কথাও আলোচিত হয়েছে। ভূদেব মুখোপাধ্যায়-এর হাতে যে ঐতিহাসিক উপন্যাসের জন্ম হয়েছিল, সে কথাও এখানে আপনারা পাবেন। এছাড়া বাংলাসাহিত্যের উল্লেখযোগ্য কিছু ঐতিহাসিক উপন্যাস সম্পর্কেও এখানে আলোচনা করা হয়েছে।

আপনি এই এককটির তিনটি ভাগ মনোযোগ সহকারে পড়ুন। তিনটি ভাগ পড়ার পর সঙ্গে দেওয়া অনুশীলনীর যথাযথ উত্তর আপনি নিশ্চয় দিতে পারবেন। প্রয়োজনে উত্তরমালার সঙ্গে মিলিয়ে নিন।

৯৪.৩ মূলপাঠ- ১ কথাসাহিত্য ঃ উপন্যাস

কথাসাহিত্য বলতে আমরা গল্প-উপন্যাস উভয়কেই বুঝে থাকি। এখানে আমাদের আলোচ্য বিষয় যদিও উপন্যাস তবে উপন্যাসের আলোচনা করতে গেলেও গল্পের কথা কিছু চলে আসে। গল্পের প্রতি মানুষের চিরকালই আকর্ষণ ছিল এবং থাকবেও। প্রাচীন যুগে বনচারী মানুষ যখন সারাদিনের পরে নিজের আস্তানায় ফিরে আসত, তখন তাদের বিনোদনের একমাত্র অবলম্বন ছিল নৃত্যগীত এবং সেই নৃত্যগীতের মধ্যে তাদের নিজেদের জীবনকাহিনী-ই লুকিয়ে থাকত। এইভাবে মানুষ নিজের জীবনকে অবলম্বন করেই গল্প বানাতে শিখেছিল। পুরোনো যুগের মানুষ অলৌকিকতায় বিশ্বাস করত, ভয় পেত, তাই প্রাচীন যুগের গল্প অনেকসময় অবিশ্বাস্য ঘটনাকে অবলম্বন করে গড়ে উঠত। আস্তে আস্তে অলৌকিকতার পাশাপাশি যুদ্ধ, প্রেম, ভালোবাসা ইত্যাদি নানা বিষয় অবলম্বন করে আখ্যান গড়ে উঠতে থাকে। সেই সমস্ত অপরিণত গদ্য-আখ্যান ক্রমে পরিণত উপন্যাসের রূপ লাভ করে সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনের হাত ধরে।

গদ্য-আখ্যানকে মূলতঃ দু'ভাগে ভাগ করা হয়। একটিকে বলা হয় রোমান্স, যাতে প্রাধান্য থাকে

অনৈসর্গিক, অলৌকিক ঘটনাবলীর। আর অপরটিকে বলা হয় উপন্যাস। এখানেও কাহিনী থাকে, তবে সে কাহিনী বাস্তব, বিশ্বাসযোগ্য ও যুক্তিগ্রাহ্য। উপন্যাসেও রোমান্সের উপাদান অবশ্য থাকতে পারে। তবে অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপীয় লেখকরা বুঝতে পেরেছিলেন, বাস্তব মানুষের কাহিনী, চরিত্র ইত্যাদি উপন্যাসের মূল উপকরণ। তার আগে মধ্যযুগের ইউরোপীয় সাহিত্যে উপন্যাস জাতীয় রচনার উল্লেখ পাওয়া যায়। মধ্যযুগে ইতালিতে "নভেলা"-র জনপ্রিয়তার কথা এখানে উল্লেখ করতে হয়। ইতালীয় লেখক বোকাচিও "Novella Storie" নাম দিয়ে কতকগুলি গল্প লিখেছিলেন। "নভেল" (উপন্যাস) শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে এই "নভেলা" থেকে।

ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দী থেকেই ইউরোপে দেশীয় ভাষা অবলম্বনে নানা ধরণের গল্প লেখা শুরু হয়। এর মধ্যে ছিল রাখালিয়া পটভূমিতে লেখা রোমান্টিক গল্প। ঐ সময় স্পেনে পিকারেস্ক কাহিনীর প্রচলন হয়, যার নায়ক হত নিম্নবর্গের কোনো দুঃসাহসী ব্যক্তি (পিকারো) এবং সেই ব্যক্তির দুঃসাহসিক কার্যকলাপই গল্পের প্রধান আকর্ষণ ছিল। এগুলিকে আমরা উপন্যাসের পূর্বপুরুষ বলতে পারি। অষ্টাদশ শতাব্দীতে এসে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিকাশ, রাজনৈতিক আবহাওয়া, সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি মানুষের মনকে এমন ভাবে প্রভাবিত করেছিল যে, তখন থেকেই উপন্যাস রচনার পটভূমি তৈরী হয়ে গিয়েছিল। প্রথম দিকে মানুষ কিছু উদ্ভট, অসম্ভব কাহিনীর দিকে ঝুঁকলেও, আস্তে আস্তে ইংরেজি সাহিত্যে রিচার্ডসন, গোল্ডস্মিথ, জার্মানীর উইলেন্ড, গ্যয়ঠে, ফরাসী দেশের মাদাম ফেয়েত্তে, মারিভোস প্রেভোস - উপন্যাসের গোড়াপত্তন করেন। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপীয় সাহিত্যে সমাজ ও পরিবারকে কেন্দ্র করে যুগান্তকারী উপন্যাস রচিত হল। এইভাবে ক্রমে ক্রমে সময় যত বদলাতে লাগল, উপন্যাসে তত বৈচিত্র্য সৃষ্টি হতে লাগল। বিংশ শতাব্দীর ইউরোপীয় উপন্যাসে তাই নানা বিচিত্রতা দেখা যায়, এবং সেই বৈচিত্র্যসৃষ্টির বিরাম আজ পর্যন্ত হয়নি, হয়তো হবেও না।

এতো গেল পাশ্চাত্য সাহিত্যের কথা, এবার আমরা আসি বাংলা উপন্যাস প্রসঙ্গে। মধ্যযুগে ধর্মপ্রধান কাব্যসাহিত্যে মানবজীবনের কাহিনীর অস্তিত্ব ছিল। তার আগে "কথাসরিৎসাগর", 'দশকুমারচরিত্র", "কাদম্বরী" ইত্যাদি সংস্কৃত গদ্য রোমান্স এবং "পঞ্চতন্ত্র", 'হিতোপদেশ", "বেতালপঞ্চবিংশতি" ইত্যাদি নীতিগল্প সুপরিচিত ছিল। এছাড়া ছিল জাতকের কাহিনী যা পালি ভাষায় রচিত হয়েছিল। কিন্তু যাকে কথাসাহিত্য বলা হয়, সংস্কৃত ও পালিভাষায় তার নিদর্শন মেলে না। মধ্যযুগের বাংলাসাহিত্যে মঙ্গলকাব্য রচিত হয়েছিল, যার মধ্যে মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর "চণ্ডীমঙ্গল" কাব্যে উপন্যাসের কিছু লক্ষণ পাওয়া যায়। কিন্তু যথার্থ উপন্যাস বলতে যা বোঝায়, ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে তা গড়ে ওঠে।

প্যারিচাঁদ মিত্র রচিত আলালের ঘরের দুলাল বাংলা সাহিত্যের প্রথম যথার্থ উপন্যাস রূপে অভিহিত হয়ে থাকে। তাই প্যারিচাঁদ মিত্র-ও বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছেন।

তবে সময়ের কথা মাথায় রাখলে অবশ্য বলতে হয় "ফুলমণি ও করুণার বিবরণ" বাংলা সাহিত্যের প্রথম উপন্যাস। ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা খ্রিশ্চিয়ান ট্র্যাক্ট অ্যান্ড বুক সোসাইটির উদ্যোগে ঐ মিশনের এক খ্রিশ্চিয়ান বিদেশিনী হানা ক্যাথেরীন ম্যুলেন্স ভালোভাবে বাংলা শিখে দেশী খ্রীষ্টান সমাজের কাহিনী অবলম্বনে এই গ্রন্থটি রচনা করেন। যদিও প্যারীচাঁদের আলালের ঘরের দুলাল রচনার কয়েকবছর আগেই গ্রন্থটি মুদ্রিত হয়েছিল, তা সত্ত্বেও "ফুলমণি ও করুণার বিবরণ"কে প্রথম বাংলা উপন্যাসের মর্যাদা দানে কুণ্ঠা দেখা যায় কতকগুলি কারণে—

(১) গ্রন্থবর্ণিত কাহিনীতে যেহেতু খ্রীষ্টান পরিবারের ঘটনাই প্রাধান্য পেয়েছে, তাই বাঙালী হিন্দু পাঠকসমাজে গ্রন্থটির কোন প্রচার হয়নি,

(২) যেহেতু খ্রীষ্টান পরিবারের কাহিনী, তাই খ্রীষ্টধর্ম উপন্যাসটির মজ্জায় মজ্জায় ছড়িয়ে আছে। সেজন্য সাধারণ হিন্দু সমাজ উপন্যাসটি সম্বন্ধে এবং এর লেখিকা সম্পর্কে বিশেষ কোনো আগ্রহ দেখাননি।

(৩) উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীরা বাংলাদেশের বিশেষ কোনো অংশের প্রতিনিধিত্ব করেনি এবং তাদের জীবিকা, জীবনসংগ্রাম সম্পর্কে বিশিষ্ট কোনো ধারণার অভাব আছে উপন্যাসে।

"ফুলমণি ও কুরণার বিবরণ"-এর দীর্ঘ, নীরস লেখা কোনদিক থেকেই তখনকার পাঠকদের চিত্ত জয় করতে পারেনি। বরং তার ছয় বছর পরে অর্থাৎ ১৮৫৮ খ্রীঃ রচিত "আলালের ঘরের দুলাল"-এর সরস কাহিনী সহজেই পাঠকের মন জয় করে নিয়েছিল। উপন্যাসটির মধ্যে বাংলা সাহিত্যের প্রথম যে সব বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা গেল সেগুলি হ'ল—

(১) এখানে উপন্যাসোচিত একটি সমস্যার সন্ধান পাওয়া গেল। নায়কের জীবনের বিভিন্ন সমস্যার ছবি এখানে পাওয়া যায়।

(২) কলকাতা ও প্রাচীন গ্রাম -জীবন, শহরতলীর বড়োলোকদের সমাজ, পল্লীবাংলার চাষী, জমিদার, নীলকর সাহেব — ইত্যাদি নানা পরিবেশের ছবি উপন্যাসে পাওয়া যায়।

(৩) লেখকের একটি মুক্ত মনের পরিচয় উপন্যাসে পাওয়া যায়। কোনো প্রকার নীতিশাস্ত্র লেখকের দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করেনি।

(৪) এই উপন্যাসের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এর ভাষা। উপন্যাসটির হালকা চালের কথ্য ভাষাকে "আলালী ভাষা" বলা হয়। প্যারীচাঁদের ধারণা ছিল, এই চলিত ঘেঁষা আধা সাধুভাষা কথাসাহিত্যের আদর্শ ভাষা। এ প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের মন্তব্য এখানে উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেছেন, "তিনিই প্রথম দেখাইলেন যে, সাহিত্যের প্রকৃত উপাদান আমাদের ঘরেই আছে - তাহার জন্য ইংরাজী বা সংস্কৃতের কাছে ভিক্ষা করিতে হয় না। তিনিই প্রথম দেখাইলেন যে, যেমন জীবনে তেমনই সাহিত্যে ঘরের সামগ্রী যত সুন্দর, পরের সামগ্রী তত সুন্দর বোধ হয় না। তিনিই প্রথম দেখাইলেন যে, যদি সাহিত্যের দ্বারা বাঙ্গালা দেশকে উন্নত করিতে হয়, তবে বাঙ্গালা দেশের কথা লইয়াই সাহিত্য গড়িতে হইবে।"

এইসব নানা কারণে "আলালের ঘরের দুলাল" কে বাংলা সাহিত্যের প্রথম উপন্যাস বলে গণ্য করা হয়।

"আলালের ঘরের দুলাল"-কে অবলম্বন করে বাংলা উপন্যাসের যে যাত্রা শুরু হয়েছে, তা আজও অব্যাহত। নানা বিষয় অবলম্বন করে অজস্র বাংলা উপন্যাস রচিত হয়েছে, হচ্ছে এবং হবে। বিষয় এবং প্রকাশভঙ্গির দিক থেকে বিবেচনা করে বাংলা উপন্যাসকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যেমন- সামাজিক উপন্যাস, পত্রোপন্যাস, ঐতিহাসিক উপন্যাস, সাংকেতিক ও প্রতীকধর্মী উপন্যাস, আত্মজৈবনিক উপন্যাস, কাব্যধর্মী উপন্যাস, আঞ্চলিক উপন্যাস, রাজনৈতিক উপন্যাস ইত্যাদি। এই এককে আমরা সামাজিক উপন্যাস ও ঐতিহাসিক উপন্যাস সম্পর্কে আলোচনা করে পরবর্তী এককগুলিতে ভিন্ন প্রকারের উপন্যাস সম্পর্কে আলোচনা করব।

৯৪.৪ সারাংশ ১

উপন্যাসের প্রসঙ্গ আলোচনা করতে গেলে গল্পের কথা এসে যায়। প্রাচীন যুগে অলৌকিক গল্প গড়ে উঠলেও, যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য বিষয় নিয়েও গদ্য-আখ্যান রচিত হয়েছে। প্রথম দিকে এইসব গদ্য-আখ্যান অপরিণত, কিন্তু পরবর্তীকালে তার থেকেই উপন্যাসের সৃষ্টি হয়েছে।

গদ্য-আখ্যান দুভাগে বিভক্ত — রোমান্স ও উপন্যাস। রোমান্সে কল্পনার প্রাধান্য, আর উপন্যাসে থাকে বাস্তব বিশ্বাসযোগ্য ঘটনা। মধ্যযুগের ইতালীয় লেখক বোকাচিও "Novella Storie" নামে কতকগুলি গল্প লেখেন, এই "নভেলা" থেকেই "নভেল" শব্দটির উৎপত্তি।

ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীতে রাখালিয়া পটভূমিতে লেখা রোমান্টিক গল্প ইউরোপে রচিত হতে শুরু করেছিল। ঐ সময় স্পেনে কোনো ব্যক্তিকে নিম্নবর্গের দুঃসাহসিক অভিযাত্রী (পিকারো) নিয়ে পিকারেস্ক কাহিনীর প্রচলন হয়। এগুলি উপন্যাসের পূর্বপুরুষ। মোটামুটি অষ্টাদশ শতাব্দী থেকেই পাশ্চাত্য উপন্যাস রচনার পটভূমিটি তৈরী হয়ে যায়।

বাংলাসাহিত্যেও ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকে উপন্যাস রচনা শুরু হয়। যদিও মধ্যযুগের চণ্ডীমঙ্গলকাব্যে উপন্যাসের লক্ষণ পাওয়া যায়। তা সত্ত্বেও যথার্থ বাংলা উপন্যাসের জন্ম ঊনবিংশ শতাব্দীতেই।

প্যারীচাঁদ মিত্রের "আলালের ঘরের দুলাল" বাংলা সাহিত্যের প্রথম উপন্যাস। যদিও সময়ের দিক দিয়ে হানা ক্যাথেরীন ম্যুলেন্স-এর "করুণা ও ফুলমণির বিবরণ" এর আগে রচিত হয়েছিল, তা সত্ত্বেও উপন্যাসের লক্ষণ বিচারে আলালের ঘরের দুলালকেই বাংলা সাহিত্যের প্রথম উপন্যাস বলা হয়।

৯৪.৫ অনুশীলনী ১

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর করুন প্রয়োজনে মূলপাঠ আবার পড়ুন। সবশেষে উত্তরমালার সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন।

(১) উপন্যাসের জন্ম কিভাবে হ'ল, তা বর্ণনা করুন।

(২) পাশ্চাত্য উপন্যাস ও বাংলা উপন্যাসের উদ্ভব কিভাবে হ'ল, তার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিন।

(৩) বাংলা সাহিত্যের প্রথম যথার্থ উপন্যাস কোনটিকে বলা হয় ও কেন বলা হয়, তা বুঝিয়ে দিন।

(৪) সঠিক উত্তরে টিক (✓) চিহ্ন দিন ঃ

(ক) কথাসাহিত্য বলতে আমরা বুঝি (১) গল্পকে (২) উপন্যাসকে (৩) উভয়কেই

(খ) "Novella Storie"-র লেখক (১) গোল্ডস্মিথ (২) বোকাচিও (৩) রিচার্ডসন

(গ) "আলালের ঘরের দুলাল"-এর রচনাকাল (১) ১৮৫২, (২) ১৮৫৮, (৩) ১৮৬০

(৫) শূন্যস্থান পূরণ করুন

(ক) — বলতে আমরা গল্প — উভয়কেই বুঝে থাকি।

(খ) গদ্য — মূলতঃ — ভাগ করা হয়।

(গ) — শব্দটির — হয়েছে এই — থেকে।

৯৪.৬ মূলপাঠ -২ সামাজিক উপন্যাসের সংজ্ঞা ও বিকাশের ধারা

পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের ছোটোখাটো সুখদুঃখের কথা যে উপন্যাসে থাকে, সেই উপন্যাসকে সামাজিক উপন্যাস বলা হয়। পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে রাষ্ট্রিক, অর্থনৈতিক এবং ধর্ম সম্পর্কিত চিন্তা ভাবনার পরিচয়ও কখনো কখনো সামাজিক উপন্যাসে পাওয়া যায়। সমাজ, অর্থনীতি, ধর্মনীতি ইত্যাদির প্রভাব চরিত্র ও ঘটনার ওপর কিভাবে পড়ে এবং জীবনের সংকট সৃষ্টি করে, তা-ই এই জাতীয় উপন্যাসে দেখানো হয়।

সামাজিক উপন্যাসকে কেউ কেউ গার্হস্থ্য বা পারিবারিক উপন্যাসও বলে থাকেন। তবে পরিবারের কথা প্রাধান্য লাভ করলে বা গৃহ জীবনের আলেখ্য বর্ণিত হলে সামাজিক উপন্যাসের পারিবারিক সংজ্ঞাপ্রাপ্তি ঘটে।

বাংলা সাহিত্যে উপন্যাস আধুনিক যুগের সৃষ্টি। জন্মলগ্নে বাংলা উপন্যাস ছিল সামাজিক। মূলপাঠ ১-এ আলোচিত প্যারীচাঁদ মিত্রের "আলালের ঘরের দুলাল" উপন্যাসটি সমাজকে নিয়েই গড়ে উঠেছিল। তবে যথার্থভাবে বলতে গেলে বঙ্কিমচন্দ্রের লেখনীমুখেই সামাজিক উপন্যাসের প্রতিষ্ঠা।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত "বিষবৃক্ষ"-ই বাংলা সাহিত্যের প্রথম সামাজিক উপন্যাস। উপন্যাসের কাহিনীটি বলে দেয়, এই উপন্যাস একেবারে স্বতন্ত্র। এই উপন্যাসের পাত্র-পাত্রী সবাই সামাজিক। তারা আমাদের ঘর-সংসারের মানুষ। তাদের সমস্যাও সামাজিক। কুন্দনন্দিনী নামে এক বালবিধবার রূপের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে নগেন্দ্রনাথ নামে এক ধনাঢ্য ভূস্বামী নিজের স্ত্রী সূর্যমুখীর প্রতি উদাসীন হলেন। ফলে সামাজিক দিকে আলোড়ন ঘটল - কুন্দের সঙ্গে নগেন্দ্র-র বিয়ে হ'ল আর সূর্যমুখীর সঙ্গে হ'ল বিচ্ছেদ। সূর্যমুখী গৃহত্যাগ করলে নগেন্দ্র-র ভুল ভাঙল। সে কুন্দকে ছেড়ে সূর্যমুখীর সন্ধানে চলল। অনেক ঘটনার পর সূর্যমুখী ও নগেন্দ্রর মিলন ঘটল। আর অন্যদিকে কুন্দনন্দিনী বিষপান করে আত্মহত্যা করল। সব মিলিয়ে দেখা যায় উপন্যাসটিতে বিধবা-বিবাহ আন্দোলন, নব্যবঙ্গ সম্প্রদায়ের উৎকেন্দ্রিকতার প্রতি কটাক্ষ, বহুবিবাহ নিরোধ ভাবনা নিয়ে নায়কের বিবেক-দংশন স্থান পেয়েছে। এইভাবে বাংলা সাহিত্যে নতুন ধরনের সামাজিক উপন্যাসের জন্ম হ'ল এবং বাংলা সাহিত্য নতুন পথে চলার ইঙ্গিত খুঁজে পেল।

"বিষবৃক্ষ" উপন্যাসটি ছাড়া তিনি আরো দুটি সামাজিক উপন্যাস রচনা করেছিলেন — "কৃষ্ণকান্তের উইল" (১৮৭৮ খ্রীঃ) ও "রজনী" (১৮৭৭ খ্রীঃ)। প্রথমে আসা যাক "কৃষ্ণকান্তের উইল" উপন্যাসে। উপন্যাসটি বঙ্গসাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ সামাজিক উপন্যাস এবং বঙ্কিম প্রতিভার সর্বশ্রেষ্ঠ দান। এই উপন্যাসের কাহিনী, চরিত্র সবকিছুই সমাজ ও সময়কে তুলে ধরেছে। উপন্যাসের কাহিনী গড়ে উঠেছে পুরুষের আত্মসংযমে অনীহা, স্ত্রীকে ত্যাগ করে অন্য স্ত্রীলোক নিয়ে মত্ত হওয়া এবং তার ফলে শোচনীয় পরিণামকে নিয়ে। এই উপন্যাসের নায়ক সমাজ ও সময়। উপন্যাসটির বিষয় পুরোনো হলেও তা নতুনযুগের সামাজিক ও মানবিক চেতনায় প্রতিষ্ঠিত।

ইংরেজ ঔপন্যাসিক লিটন রচিত "The Last Days of Pompeii" উপন্যাসের কানা ফুলওয়ালী নিদিয়া চরিত্রের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বঙ্কিমচন্দ্র রচনা করলেন "রজনী" উপন্যাসের জন্মান্ধ রজনী চরিত্রটিকে। উপন্যাসের মূল ঘটনা হ'ল নানা পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে রজনীর সঙ্গে নায়ক শচীশের বিয়ে এবং তারপরে কোনও মহাপুরুষের কৃপায় রজনীর দৃষ্টিশক্তি লাভ। এর পাশাপাশি অমরনাথ ও

লবঙ্গলতার কাহিনী, যাকে উপকাহিনী বলা যেতে পারে, পরিবেশিত হয়েছে। সমকালীন সমাজ ও সময়ের ছবি উপন্যাসের মধ্যে পাওয়া যায়।

সামাজিক উপন্যাস রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের হাতে এক নতুন মাত্রা পেল। পূর্ববর্তী বঙ্কিমচন্দ্রের সামাজিক উপন্যাসে রোমান্সের লক্ষণ থাকলেও রবীন্দ্রনাথের সামাজিক উপন্যাস রোমান্সমুক্ত। রবীন্দ্রনাথের প্রথম সামাজিক উপন্যাস "চোখের বালি" ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয়। বলা যেতে পারে এই উপন্যাসটি থেকেই বাংলা উপন্যাস বাস্তবিক অর্থে সামাজিক উপন্যাস হয়ে উঠল। উপন্যাসে দুজন পুরুষ ও দুজন স্ত্রীলোকের জীবনের সমস্যা কিভাবে জট পাকিয়ে গিয়েছিল, কেমন করে তার গ্রন্থিমোচন হ'ল, বাঙালী সমাজ ও পারিবারিক জীবনের যুগসঞ্চিত সংস্কারে কবিগুরু কিভাবে আঘাত দিলেন, তার বলিষ্ঠ বিশ্লেষণাত্মক বর্ণনা উপন্যাসে পাওয়া যায়। উপন্যাসটির মধ্যে যে প্রেম বর্ণিত হয়েছে তা সমাজনীতির দিক থেকে বিগর্হিত। মহেন্দ্র, আশা, বিহারী, বিনোদিনী এই চার যুবক-যুবতীর মনস্তত্ত্বের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে উপন্যাসে সামাজিক সমস্যার রূপটি প্রতিফলিত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী সামাজিক উপন্যাস "গোরা" (১৯১০ খ্রীঃ)। এক বিশাল মহাকাব্যিক পটভূমিকায় দেশ-কাল-সমাজ-সময়-যুগ সবকিছুই এই উপন্যাসে মূর্ত হয়ে উঠেছে। সমকালীন হিন্দু-ব্রাহ্ম তর্ক, জাতপাতের উগ্র সহনশীল রূপ, ভারতীয় সমাজ-সময়ের সর্বজাতি ও সর্বধর্মী সমন্বয়ী রূপ - বিনয়, ললিতা, গোরা, সুচরিতা, কৃষ্ণদয়ালবাবু, পরেশবাবু ও আনন্দময়ীর মধ্যে দিয়ে রূপায়িত হয়েছে। সমগ্র উপন্যাসটি ভারতীয় সমাজজীবনের প্রতিরূপ।

"চতুরঙ্গ" উপন্যাসটি ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। বাংলা সামাজিক উপন্যাসের ক্ষেত্রে "চতুরঙ্গ" এক উল্লেখযোগ্য সংযোজন। শচীশ ও দামিনীর মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব নিয়ে উপন্যাসটি রচিত হয়েছে। উপন্যাসটিতে কতকগুলি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়, যা শুধু সামাজিক উপন্যাসের ক্ষেত্রে নয়, সমগ্র বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে এক অন্য মাত্রা যোগ করেছে—

(১) এর আগে পর্যন্ত সামাজিক উপন্যাসের নায়করা ছিলেন ব্রাহ্মণ, কিন্তু এই প্রথম সামাজিক উপন্যাসের নায়ক হলেন কায়স্থ - সোনার বেনে।

(২) বাংলা সামাজিক উপন্যাসের নায়করা এতদিন আস্তিক থাকলেও এই উপন্যাসে নায়ক শচীশ ঘোরতর নাস্তিক।

(৩) এতদিন সামাজিক উপন্যাসে ভৌগোলিক স্থান-কালের নাম থাকলেও, "চতুরঙ্গ" উপন্যাসে তা পাওয়া যায় না।

এগুলি ছাড়াও রবীন্দ্রনাথের 'যোগাযোগ" "ঘরে বাইরে" ইত্যাদি উপন্যাসেও সামাজিক উপন্যাসের লক্ষণ পাওয়া যায়। "যোগাযোগ" উপন্যাসে মধুসূদন ও কুমুদিনীর বিড়ম্বিত দাম্পত্য জীবনের অশান্তি এবং তার পরিণাম মুখ্য বিষয়। হঠাৎ ধনী হয়ে ওঠা শিক্ষাসংস্কৃতিবর্জিত মধুসূদন পড়তি ঘরের মার্জিত মেয়ে কুমুদিনীকে বিয়ে করল। কুমুদিনীর চরিত্রে তার অগ্রজের স্নিগ্ধমধুর আভিজাত্যমণ্ডিত প্রভাব, অন্যদিকে মধুসূদনের স্থূলতর আকাঙ্ক্ষার অশুচি পীড়ন - কুমুদিনীর জীবন যখন ব্যর্থ হতে বসেছিল - তখন সে আবিষ্কার করল সে সন্তানসম্ভবা। উপন্যাসের চরিত্রগুলিতে বৈচিত্র্যের অভাব আছে।

"ঘরে বাইরে" উপন্যাসে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পটভূমিকায় বিমলা, তার স্বামী নিখিলেশ এবং নিখিলেশের বন্ধু সন্দীপ - এই ত্রিভুজের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। উপন্যাসের একদিকে বিমলার চরিত্রে দুই পুরুষের আকর্ষণ, আর একদিকে উগ্র স্বাদেশিকতার নগ্নমূর্তি ফুটিয়ে তুলে রবীন্দ্রনাথ লোভী স্বাদেশিকতার বীভৎস আকার তুলে ধরেছেন। উপন্যাসের চরিত্রদ্বন্দ্ব, উগ্র জাতীয়তাবাদের পরিণাম এবং

নারীর সামাজিক অধিকার সম্বন্ধে তিনি সর্বপ্রথম প্রগতিশীল দৃষ্টিকোণ থেকে এক যুগের বাঙালী জীবনের ছবি এঁকেছেন।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের হাতে বাংলা সামাজিক উপন্যাস যেন সমাজ ও সময়ের অন্তঃসত্তায় প্রবেশ করল। তাঁর প্রথম সামাজিক উপন্যাস "পল্লীসমাজ" (১৯১৬ খ্রীঃ)। এখানে রয়েছে জমিদার, ব্রাহ্মণ ও আচারের শাসনের ফলে সাধারণ মানুষের সঙ্কট। কোনো বিশেষ সামাজিক প্রথার প্রতি উপন্যাসে কটাক্ষপাত না করা হলেও, পল্লী সমাজের সমগ্র জীবনযাত্রার একটা নিখুঁত প্রতিকৃতি এখানে পাওয়া যায়। সামাজিক দলাদলির ছবিতে যে নীচতা, কাপুরুষতা, কৃতঘ্নতার ছবি পাওয়া যায়, তাতে আমাদের সমাজজীবনের মূল আদর্শগুলি সম্বন্ধে সন্দেহ জেগে ওঠে।

পরবর্তী সামাজিক উপন্যাস "গৃহদাহ" (১৯২০ খ্রীঃ)তে সম্পূর্ণ নতুন বিষয় আবির্ভূত হয়েছে। অচলার মধ্যেকার অন্তর্দ্বন্দ্বই উপন্যাসে সমাজ ও সময়কে ধরে রেখেছে।

শরৎচন্দ্রের "দেনা পাওনা" (১৯২৩ খ্রীঃ) উপন্যাসে লক্ষ্য করা যায় নিজের বিবাহিতা পরিত্যক্তা স্ত্রী, অধুনা চণ্ডীগড়ের ভৈরবী ষোড়শীর সংস্পর্শে অত্যাচারী, লম্পট, পাপপূণ্য জ্ঞানহীন জমিদার জীবনানন্দের অভূতপূর্ব পরিবর্তন। এছাড়া তাঁর "চরিত্রহীন", "শেষপ্রশ্ন" — ও সামাজিক উপন্যাস। উপরিউক্ত উপন্যাসগুলি থেকে দেখা যাচ্ছে শরৎচন্দ্র বাংলাদেশের নিতান্ত সাধারণ নরনারীর মলিন ও তুচ্ছ জীবনকে উপন্যাসের উপাদান হিসাবে গ্রহণ করেছেন। মানবজীবনের সুখদুঃখ ও অশ্রুবেদনাকে সহানুভূতির রসে ডুবিয়ে এমন স্নিগ্ধমধুর ও বেদনাবিধুর কাহিনী আর কেউ লিখতে পারেননি। সমাজের তথাকথিত চরিত্রনীতি, সতীত্ব, সংযম প্রভৃতি আদর্শকে উড়িয়ে দিয়ে, সমাজের অবিচার এবং সেই অবিচারের চাকায় পিষ্ট মানবমানবীর কাহিনী লিখে তিনি সমাজের শিক্ষিত স্তরে আঘাত হেনেছিলেন।

সামাজিক উপন্যাসের বিকাশের ধারায় এবার আমাদের আলোচ্য হলেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। সামাজিক ও মানবিক নানা সমস্যা নিয়ে এতদিন সামাজিক উপন্যাস রচিত হচ্ছিল, বিভূতিভূষণের হাতে তার পরিধি বিস্তৃত হ'ল। তাঁর উপন্যাসে মানুষ ও সমাজের পাশাপাশি, প্রকৃতিও সমানভাবে স্থান করে নিল। "পথের পাঁচালী" উপন্যাসের পটভূমি দক্ষিণ নিম্নবঙ্গ। এখানকার প্রকৃতির সঙ্গে অপু, দুর্গার যে সম্পর্ক তা সমাজ ও সময়কে ভিন্নভাবে মূর্ত করল। আবার "আরণ্যক" উপন্যাসে বাংলাদেশ এবং তার সঙ্গে বিহারের অরণ্যের কিছু ছবিও পাওয়া যায় এবং তার সঙ্গে সঙ্গে অরণ্য লালিত মানুষের ছবিও উপন্যাসে পাওয়া যায়।

বিভূতিভূষণের সামাজিক উপন্যাস প্রকৃতিকে অবলম্বন করেছিল, আর তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সামাজিক উপন্যাস অবলম্বন করল মাটিকে অর্থাৎ আঞ্চলিকতাকে। ফলে সামাজিক উপন্যাসের এক নতুন ভাবধারা আবারও লক্ষ্য করা গেল। তারাশঙ্করের এই নতুন ধরণের সামাজিক উপন্যাসগুলি হ'ল "কবি" "গণদেবতা", "হাঁসুলিবাঁকের উপকথা" ইত্যাদি।

"কবি" উপন্যাসে অন্ত্যজ মানুষের প্রেম -অপ্রেম, আশা- নিরাশার কাহিনী আছে। হাড়ি জাতির যুবক নিতাই এই উপন্যাসের নায়ক। আগে কোনো ঔপন্যাসিক যা ভাবতে পারেননি, সেই নীচুজাতের মানুষকে নায়ক-নায়িকা করে তারাশঙ্কর তাঁর সামাজিক উপন্যাসের পত্তন করলেন।

"গণদেবতা" উপন্যাসে একটা দেশ, একটা জাতির মোড় ফেরার ঘটনা পাওয়া যায়। আধুনিক পরিবর্তনের প্রভাবে গ্রাম্য সমাজের প্রাচীন রীতি-নীতি ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিপর্যয়ের কথা এখানে আলোচিত হয়েছে।

আবার "হাঁসুলিবাঁকের উপকথা"তে একটা সমগ্র গোষ্ঠীর প্রাণস্পন্দন, মর্মরহস্য, সমগ্র সমাজবিন্যাসের

মূলতত্ত্ব প্রতিবিম্বিত হয়েছে। বাঁশবাঁদি অঞ্চলের মানুষ, তাদের জীবনের ছবি এখানে পাওয়া যায়। কাহার পাড়ার নেতা বনোয়ারী, নবযুগের প্রতিনিধি করালী, প্রেম ও বাসনার প্রতীক কালোশশী, অতীত ইতিহাসের দূত সুচাঁদ পিসি, এবং কর্তা বাবা - সকলেই সমাজ সময়ের বিভিন্ন পরিচয় নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। "হাঁসুলিবাঁকের উপকথা" সামাজিক উপন্যাসটিতে আঞ্চলিক সমাজই প্রধান বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে। এই উপন্যাসের প্রকৃত নায়ক নিম্নজাতির সমাজ—যে সমাজ বহু শতাব্দীর শিক্ষা-দীক্ষায়, কর্মে ও চিন্তায়, এক জীবন্ত অত্যাজ্য সংস্কৃতির আধাররূপে বিকশিত হয়েছে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর উপন্যাসে সামাজিক জীবনের ছবির সঙ্গে ফ্রয়েডীয় মনোসমীক্ষণবাদের প্রয়োগ ও বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ শক্তির মিশ্রণ ঘটালেন। তাঁর উপন্যাসেই প্রথম নগ্ন বাস্তবতার ছবি পাওয়া যায়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত "পদ্মানদীর মাঝি" এবং "পুতুল নাচের ইতিকথা" উপন্যাস দুটিকে আমরা সামাজিক উপন্যাস হিসাবে চিহ্নিত করতে পারি।

"পদ্মানদীর মাঝি" উপন্যাসে পদ্মা তীরবর্তী জেলেদের আহার, ব্যবহার, পোশাক, উৎসব সবকিছুই উপন্যাসটিকে স্বতন্ত্র্য করে দিয়েছে। উপন্যাসের নায়ক কুবের যখন ময়নাদ্বীপে যাত্রা করছে তখন সে যেন এক ভিন্ন সমাজে যাত্রা করছে। আবার "পুতুল নাচের ইতিকথা" উপন্যাস চেতন মনের সঙ্গে অচেতন মনের যে দ্বন্দ্ব নিয়ত মানুষকে নাচিয়ে বেড়ায়, তা নিয়ে গড়ে উঠেছে। গাউদিয়া গ্রামের জীবনযাত্রা প্রণালী ও বিশেষ কয়েকটি সমস্যার যে ছবি উপন্যাসে আঁকা হয়েছে তা এক হিসাবে আমাদের সাধারণ পল্লীসমাজেরই ছবি। শশী এইগ্রাম ছেড়ে কলকাতায় যেতে চেয়েছিল, পারেনি। কুসুম চেয়েছিল শশীর প্রেম, পায়নি। এই অপ্রাপ্তিই উপন্যাসে সবাইকে পুতুলে পরিণত করেছে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় পরবর্তীকালে সতীনাথ ভাদুড়ী, সমরেশ বসু, অদ্বৈত মল্লবর্ধন, মহাশ্বেতা দেবী, দীপেন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ ঔপন্যাসিক সামাজিক উপন্যাস রচনা করেছেন। এই পর্বে বাংলা সামাজিক উপন্যাসে শ্রমজীবী মানুষের জীবন চিত্রিত হয়েছে। বিহারের তাঙমাটোলা ও ধাঙরটোলার শ্রমজীবী মানুষের জীবনের ছবি সতীনাথ ভাদুড়ির "ঢোড়াই চরিত মানস" উপন্যাসে ফুটে উঠেছে। অদ্বৈত মল্লবর্মনের "তিতাস একটি নদীর নাম" উপন্যাসে কুমিল্লা জেলার তিতাস নামে এক অখ্যাত নদীর তীরে বাস করা জেলে - সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, পূজা-পার্বণ, উৎসব, রীতি-সংস্কৃতির একটি চিত্তাকর্ষক বর্ণনা পাওয়া যায়। উপন্যাসটির চতুর্থ খণ্ড সমাজচিত্র হিসাবে সবচেয়ে বেশি কৌতূহলোদ্দীপক। আবার সমরেশ বসুর "গঙ্গা" উপন্যাসে নদীর সঙ্গে জড়িত জীবনের কথা। মহাশ্বেতা দেবীর হাতে বাংলা সামাজিক উপন্যাস ভিন্ন মাত্রা পেয়েছে। সাঁওতাল, মুণ্ডা, হেমব্রমদের জীবন-মরণের ছবি তিনি বিশ্বস্ততার সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন। তাঁর "হাজার চুরাশির মা", "অরণ্যের অধিকার" ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস।

যুগ বদলের সাথে সাথে বাংলা সামাজিক উপন্যাসের রূপরীতিও বদলে গেছে। এই সময়কার ঔপন্যাসিকেরা হলেন কমলকুমার মজুমদার, অমিয়ভূষণ মজুমদার, দেবেশ রায়, সাধন চট্টোপাধ্যায়, রমাপদ চৌধুরী, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, কিন্নর রায়, অমর মিত্র, আবুল বাশার প্রমুখরা।

কমলকুমার মজুমদারের "অন্তর্জলী যাত্রা" সমাজবাস্তবতার রূপায়ণ। অমিয়ভূষণ মজুমদারের "মহিষকুড়ার উপকথা" একটি সামাজিক উপন্যাস। উত্তরবঙ্গের অন্ত্যজ সমাজ জীবনের ছবি দেবেশ রায়ের "মফস্বলী বৃত্তান্ত" ও "তিস্তাপারের বৃত্তান্ত" উপন্যাসদুটিতে পাওয়া যায়, আবার সাধন চট্টোপাধ্যায়ের "গহীন গাঙ" উপন্যাসে সুন্দরবন ও নদী-নালার জীবনে একদল মানুষ কেমন করে মহাজন ও নিয়তির বিরুদ্ধে লড়াই করে জীবনের প্রান্তভূমিকে চিনে নেয় - তার ছবি পাওয়া যায়।

সাম্প্রতিককালে বাংলা সামাজিক উপন্যাসের উল্লেখযোগ্য হ'ল রমাপদ চৌধুরীর "সারি", সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের "নিলয় না জানি", কিন্নর রায়ের "আগুনের সিড়ি", অমর মিত্রের "কৃষ্ণগান্ধার", আবুল বাশারের "ফুলবউ" ইত্যাদি উপন্যাস।

বাংলা সামাজিক উপন্যাসের এই বিকাশের ধারা আজও অব্যাহত এবং তা বাংলা সাহিত্যকে দিনে দিনে সমৃদ্ধ থেকে সমৃদ্ধতর করে তুলেছে।

৯৪.৭ সারাংশ - ২

সামাজিক উপন্যাসে পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের পাশাপাশি রাষ্ট্রিক, অর্থনৈতিক, ধার্মিক চিন্তাভাবনার পরিচয় যেমন পাওয়া যায়, তেমনি মানুষের চরিত্র ও নানা ঘটনার ওপর এই সমস্ত চিন্তাভাবনার প্রভাবও দেখানো হয়।

রাজনীতি, অঞ্চল, ইতিহাস সবই সমাজের অঙ্গ। সেদিক দিয়ে রাজনৈতিক, আঞ্চলিক, ঐতিহাসিক সবই সামাজিক উপন্যাসের রকমফের।

সামাজিক উপন্যাসে যখন পরিবারের কথা প্রাধান্য পায়, তখন তা পারিবারিক উপন্যাস রূপে অভিহিত হয়।

বাংলা সাহিত্যের প্রথম উপন্যাস "আলালের ঘরের দুলাল" সমাজকে অবলম্বন করেই গড়ে উঠেছে।

তবে বাংলাসাহিত্যে যথার্থ সামাজিক উপন্যাসের রচয়িতা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং যথার্থ বাংলা সামাজিক উপন্যাস 'বিষবৃক্ষ"। "বিষবৃক্ষ" ছাড়া তিনি আরো দুটি সামাজিক উপন্যাস রচনা করেছিলেন- "কৃষ্ণকান্তের উইল" ও "রজনী"। তবে তাঁর সামাজিক উপন্যাসগুলির কোনটিই বিশুদ্ধ সামাজিক উপন্যাস নয়, সেগুলি সবই রোমান্সের লক্ষণাক্রান্ত।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের হাতে সামাজিক উপন্যাস নতুন রূপ লাভ করেছে। তাঁর সামাজিক উপন্যাসগুলি রোমান্সমুক্ত সামাজিক উপন্যাস।

শরৎচন্দ্রের রচনায় সামাজিক উপন্যাস সমাজ ও সময়ের একেবারে ভেতরে প্রবেশ করল। বিভূতিভূষণের লেখনীতে সামাজিক উপন্যাসের পরিধি বিস্তার লাভ করল প্রকৃতি জগতে। তারাশঙ্করের সামাজিক উপন্যাসে আঞ্চলিকতা, আর মানিকের সামাজিক উপন্যাসে ফ্রয়েডীয় মনোসমীক্ষণবাদের প্রয়োগ ও বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণের মিশ্রণ ঘটল।

সতীনাথ ভাদুড়ীর "ঢোড়াই চরিত মানস" উপন্যাসে বিহারের তাৎমাটোলা ও ধাঙরটোলার শ্রমজীবী মানুষদের পরিচয় পাওয়া যায়। অদ্বৈত মল্লবর্মনের "তিতাস একটি নদীর নাম" উপন্যাসে জেলে সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রার পরিচয় পাওয়া যায়, সমরেশ বসুর "গঙ্গা" উপন্যাসেও জেলেদের জীবনের পরিচয় ফুটে উঠেছে। মহাশ্বেতা দেবীর সামাজিক উপন্যাস সাঁওতাল, মুণ্ডা, হেমব্রমদের নিয়ে গড়ে উঠেছে।

পরবর্তীকালে সামাজিক উপন্যাস রচনা করেছেন কমল কুমার মজুমদার, অমিয়ভূষণ মজুমদার, দেবেশ রায়, সাধন চট্টোপাধ্যায়, রমাপদ চৌধুরী, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, কিন্নর রায়, অমর মিত্র, আবুল বাশার প্রমুখ উপন্যাসিকবৃন্দ।

৯৪.৮ অনুশীলনী - ২

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর করুন। উত্তর শেষে উত্তরমালার সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন।

(১) সামাজিক উপন্যাস কাকে বলে, উদাহরণ সহ ব্যাখ্যা করুন।

(২) বঙ্কিমচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথের একটি করে সামাজিক উপন্যাস সম্পর্কে আলোচনা করুন।

(৩) বন্দ্যোপাধ্যায় ত্রয়ীর সামাজিক উপন্যাসগুলি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

(৪) শূন্যস্থান পূরণ করুন

(ক) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত —ই বাংলা সাহিত্যের প্রথম — উপন্যাস।

(খ) রবীন্দ্রনাথের — সামাজিক উপন্যাস — সালে রচিত হয়।

(গ) কমলকুমার মজুমদারের — সমাজবাস্তবতার রূপায়ণ।

(৫) সঠিক উত্তরে টিক (✓) চিহ্ন দিন ঃ

(ক) বাংলা সাহিত্যের প্রথম সামাজিক উপন্যাস (১) বিষবৃক্ষ (২) চোখের বালি (৩) কৃষ্ণকান্তের উইল

(খ) "হাজার চুরাশির মা" গ্রন্থের রচয়িতা (১) মহাশ্বেতা দেবী (২) সতীনাথ ভাদুড়ী (৩) কিন্নর রায়

(গ) সাধন চট্টোপাধ্যায় রচনা করেছেন (১) গহীন গাঙ, (২) আগুনের সিড়ি, (৩) কৃষ্ণগান্ধার

৯৪.৯ মূলপাঠ - ৩ ঐতিহাসিক উপন্যাসের সংজ্ঞা ও বিকাশের ধারা

সামাজিক বিষয়কে অবলম্বন করে বাংলা উপন্যাসের জন্ম হলেও, তার জয়যাত্রা শুরু হয়েছে ঐতিহাসিক উপন্যাসের হাত ধরে। এবং অল্প কিছুদিনেই উপন্যাসের বিভিন্ন শাখার মধ্যে ঐতিহাসিক উপন্যাস তার স্থান পাকা করে নিয়েছে।

উপন্যাস লিখতে গেলে প্রথমেই প্রয়োজন একটা নিটোল কাহিনী, চরিত্র, সংলাপ, পরিবেশ এবং ঔপন্যাসিকের জীবন সম্পর্কে ভাবনা। উপন্যাস রচনার এই প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি বজায় রেখে ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে জীবনকে দেখার চেষ্টা করা হয় ঐতিহাসিক উপন্যাসে। তবে মনে রাখতে হবে ঐতিহাসিক উপন্যাসে কেবল ইতিহাসের ঘটনা ও চরিত্র ছাড়া আরো অতিরিক্ত কিছু থাকে। ইতিহাসরস ও মানবরসের মধ্যে সম্পর্ক রচনা করে তার পটভূমিকায় মানব-জীবনের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষার ছবি অঙ্কনই ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিকের লক্ষ্য। সাধারণত ইতিহাস ও মানবজীবনের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন খুব কঠিন শিল্পকর্ম বলে, পৃথিবীর সবদেশের সাহিত্যে সার্থক ঐতিহাসিক উপন্যাসের সংখ্যা অল্প।

এই জাতীয় উপন্যাসে ঔপন্যাসিক সমসাময়িক জীবন না গ্রহণ করে, অতীতের কাহিনীকে বা বলা যায় অতীতের ইতিহাসকে সাহিত্য করে তোলেন। এই জাতীয় উপন্যাস রচনার সময়ে ঔপন্যাসিককে অতীত জীবনের ইতিহাস, রীতি-নীতি, সংস্কার, আচার-ব্যবহার, পোষাক-পরিচ্ছেদ, জীবন-যাপন প্রণালী ইত্যাদি সম্পর্কে সচেতন থাকতে হয়, নয়তো কাল অনৌচিত্য দোষ ঘটতে পারে। ঐতিহাসিক উপন্যাস সম্পর্কে ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, "ঐতিহাসিক উপন্যাসের প্রকৃত আদর্শ দূরধিগম্য; ইতিহাসের বিশাল সংঘটনের ছায়াতলে আমাদের ক্ষুদ্র পারিবারিক জীবনের চিত্র আঁকিতে হইবে, দৈনন্দিন জীবনের ঘটনার সহিত ঐতিহাসিক ঘটনার যোগসূত্রগলির মধ্যে সম্পর্কটি সুস্পষ্ট করিয়া তুলিতে হইবে। একদিকে

ইতিহাসের বিপুলতা, ঘটনাবৈচিত্র্য ও বর্ণসম্পদ ক্ষুদ্র প্রাত্যহিক জীবনে প্রতিফলিত করিতে হইবে, অন্যদিকে আমাদের বাস্তব জীবনের কঠিন নিয়মশৃঙ্খল, সত্যের কঠোর বন্ধনের দ্বারা ইতিহাসের অস্পষ্টতা ও অংশতঃ অনুমানসিদ্ধ কল্পনা-প্রবণতা নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে এবং সর্বোপরি উভয়ের মধ্যে মিলনটি সম্পূর্ণ ও অন্তরঙ্গ করিয়া তুলিতে হইবে যেন সমস্ত উপন্যাসটির আকাশবাতাসের মধ্যে একটা নিগূঢ় ঐক্য আনিতে পারা যায়।"

ঐতিহাসিক উপন্যাসকে দুভাগে ভাগ করা হয় - শুদ্ধ ও মিশ্র। শুদ্ধ ঐতিহাসিক উপন্যাসকে আবার দুভাগে ভাগ করা যায় - রাষ্ট্রনৈতিক ও সামাজিক। বঙ্কিমচন্দ্রের "রাজসিংহ", রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "রাজর্ষি" রাষ্ট্রনৈতিক শুদ্ধ ঐতিহাসিক উপন্যাস। আর দ্বিতীয় ভাগে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী-র "বেনের মেয়ে" উপন্যাসের নাম করা যায়।

মিশ্র-ঐতিহাসিক উপন্যাসকেও দুভাগে ভাগ করা যায়, প্রথম ভাগ হ'ল ইতিহাসের ছায়ায় কাল্পনিক সৃষ্টি। যেমন- রমেশচন্দ্রের "রাজপুত জীবনসন্ধ্যা", মহারাষ্ট্র জীবনপ্রভাত ইত্যাদি। আর দ্বিতীয় ভাগ হ'ল কাল্পনিক কথা-মণ্ডিত ঐতিহাসিক উপন্যাস। যেমন - রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের "শশাঙ্ক", অনুরূপা দেবীর "ত্রিবেণী"।

অনেক ঔপন্যাসিক উপন্যাস ও রোমান্সের সংযোগ ঘটিয়ে আকর্ষণীয় গল্পকাহিনী সৃষ্টি করেছেন। যেমন ইংরেজ লেখক ওয়াল্টার স্কট-এর "আইভান হো"। উপন্যাস ও রোমান্সের মধ্যে পার্থক্য আছে। মধ্যযুগে ও এলিজাবেথীয় যুগে গদ্য ও পদ্যে অলৌকিক ঘটনা, কল্পনার প্রাধান্য, রহস্যের কুহেলিকাময় পরিবেশ, বিস্ময় ও রোমান্সের সমাবেশ প্রভৃতি বৈশিষ্ট্য সম্বলিত যে সব কাহিনী রচিত হয়েছিল তাদেরই রোমান্স বলা হয়। এগুলির সঙ্গে আধুনিকযুগের রোমান্সের পার্থক্য আছে। ঐতিহাসিক উপন্যাসে রোমান্স নিজেকে আরো গভীরভাবে প্রতিষ্ঠিত করার সুযোগ পায়। রোমান্স হচ্ছে উপন্যাসধর্মী, আর রোমান্স যেহেতু অতীতাশ্রয়ী, যেহেতু সত্যের কঠোর সংযম সে স্বীকার করে নিয়েছে, তাই ইতিহাসের সঙ্গেও তাকে যোগসূত্র রক্ষা করে চলতে হয়। তবে রোমান্সের সঙ্গে ঐতিহাসকতার যোগ অচ্ছেদ্য নয়। রোমান্সের বাস্তবাতিরিক্ত কাল্পকিকতাকে খানিকটা বাস্তবতার রঙ দেবার জন্য ইতিহাসের একটা বিশেষ যুগের বিশেষ কোনো ঘটনার সঙ্গে একে সম্পর্ক রাখতে হয়। তবে ঐতিহাসিক উপন্যাস যেমন মূল সত্যকে অবিকৃত রেখে দেয়, রোমান্স লেখকের তেমন কোন দায়িত্ব নেই। তাই ইতিহাস এবং উপন্যাসের মিলনেই রোমান্স সম্ভব।

বাংলা ঐতিহাসিক উপন্যাসের সূত্রপাত ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের লেখনীমুখে। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে কস্টারের "Romance of History" অবলম্বনে তিনি রচনা করলেন "ঐতিহাসিক উপন্যাস"। উপন্যাসটির মধ্যে দুটি অংশ লক্ষ্য করা যায়—(১) সফল স্বপ্ন ও (২) অঙ্গুরীয় বিনিময়। প্রথম অংশের কাহিনী ঐতিহাসিক বীরপুরুষ সবক্তগীনকে নিয়ে রচিত হয়েছে। এই অংশে ইতিহাসের খুব বেশি পরিচয় না পাওয়া গেলেও, দ্বিতীয় অংশ "অঙ্গুরীয় বিনিময়"-এ ইতিহাসের পরিচয় পাওয়া যায় বেশ ভালোভাবেই। হিন্দু বীর শিবাজীর সঙ্গে ঔরঙ্গজেবের কন্যা রোশনারায় প্রণয়কথা এই অংশের আলোচ্য বিষয়। দুটি চরিত্রই ইতিহাস নির্ভর। এছাড়াও উপন্যাসে বর্ণিত অন্যান্য চরিত্র যেমন ঔরঙ্গজেব, শাজাহন, জয়সিংহ ইত্যাদি চরিত্রগুলিও ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকেই উঠে এসেছে। দাক্ষিণাত্য অভিযানে ঔরঙ্গজেব ও শিবাজীর সংঘাত, তারপর সন্ধিস্থাপন, জয়সিংহের কাছে পরাজয় ইত্যাদি ঘটনাগুলি ঔপন্যাসিক বেশ বিশ্বস্ততার সঙ্গেই উপন্যাসে তুলে ধরেছেন। তবে প্রণয়কাহিনীতে ঔপন্যাসিক অনেকটাই কল্পনার সাহায্য নিয়েছেন।

ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের অপর উপন্যাস "স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস" ১৮৭৫ খ্রিস্টব্দে রচিত হয়। উপন্যাসটি প্রধানত কল্পনার ওপর ভিত্তি করেই দাঁড়িয়ে আছে। তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধে মহারাষ্ট্র যদি জয়লাভ করত, তবে ভারতের ইতিহাস কোন পথে অগ্রসর হোত, তার কল্পনাময় কাহিনীই উপন্যাসটির উপজীব্য।

উপন্যাস রচনার প্রাথমিক যুগে সামাজিক অপেক্ষা ঐতিহাসিক উপন্যাসই যে বেশি রচিত হয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। প্রথম যুগের ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলি হ'ল বিনোদবিহারী গোস্বামীর "পূর্ণশশী" (১৮৭৫), ললিতমোহন ঘোষের "অচলবাসিনী" (১৮৭৫), রাখালদাস গাঙ্গুলীর 'পাষাণময়ী" (১৮৭৯) ইত্যাদি। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এই উপন্যাসগুলি সম্পর্কে বলেছেন, "এই ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলি সত্য ও কল্পনার, সাধারণ ও অসাধারণের, এমনকি প্রাকৃত ও অপ্রাকৃতের একটি অদ্ভুত সংমিশ্রণ, বাস্তব জীবনের সহিত এঁদের যোগসূত্র নিতান্ত ক্ষীণ।"

তবে ভূদেব মুখোপাধ্যায় দুটি উপন্যাস রচনা করে বাংলা কথাসাহিত্যের যে নতুন পথের দরজা খুলে দিলেন, সেই পথের পথিক হয়েছেন তাঁর সময়কার এবং পরবর্তীকালের বহু কথাসাহিত্যিক।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনার প্রথম শিল্পী। তিনিই ঐতিহাসিক উপন্যাসের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাঁর প্রথম ইতিহাস আশ্রিত উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী" (১৮৬৫)। আকবরের রাজত্বকালে ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে উড়িষ্যা ও বাংলাদেশের সীমান্তে মুঘল-পাঠানের সংঘর্ষ, উপন্যাসটির পটভূমি। উপন্যাসে আয়েষা, ওসমান, জগৎসিংহ ও তিলোত্তমার মধ্যে দিয়ে ইতিহাসকে ফোটানো হলেও, উপন্যাসটিকে ইতিহাসাশ্রিত রোমান্স বলাই সঙ্গত।

১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত "কপালকুণ্ডলা" উপন্যাসে মোগল সাম্রাজ্য, সপ্তগ্রামের ছবি ইত্যাদির উল্লেখ থাকলেও, ইতিহাসের তুলনায় উপন্যাসটির রোমান্টিক আবেদনই বেশী। বঙ্কিমের পরবর্তী উপন্যাসে যেমন "মৃণালিনী" (১৮৬৯), "চন্দ্রশেখর" (১৮৭৫), "আনন্দমঠ" (১৮৮৪), "সীতারাম" (১৮৮৭) ইত্যাদিতে অল্পবিস্তর ইতিহাস এলেও, এগুলিকে ঐতিহাসিক উপন্যাসের পর্যায়ে ফেলা যায় না।

সেদিক দিয়ে বিচার করলে "রাজসিংহ"-ই (১৮৮২) বঙ্কিমের সর্বশ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক উপন্যাস। রাজস্থানের চঞ্চলকুমারীকে ঔরঙ্গজেবের বিয়ের ইচ্ছা, ফলে রাজসিংহের সঙ্গে বিরোধ, সেই বিরোধে রাজসিংহের জয় ও চঞ্চলকুমারীর সঙ্গে বিয়ে-ইতিহাস থেকে গৃহীত।

উপন্যাসটি লেখার জন্য বঙ্কিমচন্দ্র জেমস্ টডের - Annals and Antiquities of Rajasthan এবং The General History of the Mogal Empire এই দুটি গ্রন্থের সাহায্য নিয়েছিলেন। রাজস্থানের রুপনগর রাজপ্রাসাদ থেকে কাহিনী শুরু হয়ে শেষ হয়েছে ঔরঙ্গজেবের সন্ধিচুক্তি দিয়ে। যদিও পাশাপাশি কিছু কাল্পনিক ঘটনাও উপন্যাসে এসেছে। তবু, "রাজসিংহ" কে সবদিক দিয়েই শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক উপন্যাস বলা যায়। ঐতিহাসিক উপন্যাস হিসাবে "রাজসিংহ"-র সর্বশ্রেষ্ঠ মূল্যায়ন রবীন্দ্রনাথ করেছিলেন তাঁর "আধুনিক সাহিত্য" গ্রন্থের "রাজসিংহ প্রবন্ধে-"তাহার এক-একটি খণ্ড এক-একটি নির্ঝরের মতো দ্রুত ছুটিয়া চলিয়াছে। প্রথম প্রথম তাহাতে কেবল আলোকের ঝিকিঝিকি এবং চঞ্চল লহরীর তরল কলধ্বনি-তাহার পর ষষ্ঠ খণ্ডে দেখি ধ্বনিগম্ভীর, স্রোতের পথ গভীর এবং জলের বর্ণ

ঘনকৃষ্ণ হইয়া আসিতেছে, তাহার পর সপ্তম খণ্ডে দেখি কতক বা নদীর স্রোত, কতক বা সমুদ্রের তরঙ্গ, কতক বা অমোঘ পরিণামের মেঘগম্ভীর গর্জন, কতক বা তীব্র লবণাক্ত অশ্রুনিমগ্ন হৃদয়ের সুগভীর ক্রন্দনোচ্ছ্বাস, কতক বা কালপুরুষ লিখিত ইতিহাসের অব্যাকুল বিরাট বিস্তার, কতক বা ব্যক্তি বিশেষের মজ্জমান তরণীর প্রাণপণ হাহাধ্বনি। সেখানে নৃত্য অতিশয় রুদ্র, ক্রন্দন অতিশয় তীব্র এবং ঘটনাবলী ভারত ইতিহাসের একটি যুগাবসান হইতে যুগান্তরের দিকে ব্যাপ্ত হইয়া গিয়াছে।"

বঙ্কিমচন্দ্রের পরে আমাদের আলোচ্য ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিক হলেন রমেশচন্দ্র দত্ত। তাঁর মোট ছটি উপন্যাসের মধ্যে চারটিই ঐতিহাসিক উপন্যাস। ১৮৭৪ খ্রীঃ প্রকাশিত হয় রমেশচন্দ্র দত্তের "বঙ্গবিজেতা"। উপন্যাসটিতে আকবরের সময়কার কাহিনী আছে। পরবর্তী উপন্যাস "মাধবীকঙ্কণ" ১৮৭৭ খ্রীঃ প্রকাশিত হয়। সম্রাট শাজাহানের সময়ের ঘটনা নিয়ে উপন্যাসটি রচিত। তবে উপরিউক্ত দুটি উপন্যাসে ইতিহাসের কাহিনীর চেয়ে সাধারণ মানুষের কাহিনীই বেশী প্রাধান্য পেয়েছে।

১৮৭৮ খ্রীস্টাব্দে রমেশচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক উপন্যাস "মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাত" প্রকাশিত হয়। উপন্যাসটির মূল বিষয় শিবাজীর নেতৃত্বে মারাঠা জাতির উত্থান। উপন্যাসটির সর্বত্রই অর্থাৎ যুদ্ধ, ষড়যন্ত্র, অভিমান, বীরত্ব সবকিছুর মধ্যেই ইতিহাসের ছায়া স্পষ্ট। ঔরঙ্গজেব এবং শিবাজী উভয়ের চরিত্রই ইতিহাস থেকে উঠে এসেছে। ঠিক এই জাতীয় আরেকটি উপন্যাস হ'ল "রাজপুত জীবনসন্ধ্যা"। যা প্রকাশিত হয় ১৮৭৯ খ্রীস্টাব্দে। রাণাপ্রতাপের সংগ্রাম, মোগলদের সঙ্গে সংঘাত, রাজপুতদের স্বাধীনতা স্পৃহা- ইত্যাদি ঐতিহাসিক ঘটনা উপন্যাসে স্থান পেয়েছে।

আলোচিত পরবর্তী ঔপন্যাসিক হলেন প্রতাপচন্দ্র ঘোষ। তাঁর লেখা ঐতিহাসিক উপন্যাসটি "বঙ্গাধিপ পরাজয়"। উপন্যাসটির প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয় যথাক্রমে ১৮৬৯ ও ১৮৮৪ খ্রীস্টাব্দে। ডঃ সুকুমার সেন বলেছেন, বঙ্গাধিপ পরাজয়-এ ঘটনাবলী সম্পূর্ণরূপেই ইতিহাসানুগত, সমস্ত চরিত্রই ঐতিহাসিক পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। তবে ঐতিহাসিক উপন্যাস হিসাবে এটি তেমন উল্লেখযোগ্য নয়।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের দ্বিতীয়া কন্যা স্বর্ণকুমারী দেবী ইতিহাসের ওপর ভিত্তি করে চারটি উপন্যাস রচনা করেন। প্রথমটি হ'ল "দীপনির্বাণ" (১৮৭৬)- উপন্যাসটির বিষয় মহম্মদ ঘোরীর দিল্লী আক্রমণ ও চিতোরের রাজপরিবারের কথা। পরবর্তী উপন্যাস "ফুলের মালা"। এখানে বাংলাদেশে স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা সেকেন্দার শাহের উদ্যোগে। তৃতীয় উপন্যাস "মিবার রাজ"-এর রাজপুত ও ভীলদের সংঘাতের কথা বলা হয়েছে। "বিদ্রোহ" উপন্যাসে রাজপুতদের কাহিনী এবং ভীলেদের জেগে ওঠার কাহিনী বর্ণিত হয়েছে. উপন্যাসের পরিবেশ, চরিত্র সবকিছুতেই ইতিহাসবোধের পরিচয় পাওয়া যায়।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতিকে অবলম্বন করে দুটি ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা করেছিলেন "কাঞ্চনমালা" ও "বেনের মেয়ে"। ডঃ সুকুমার সেন "বেনের মেয়ে" উপন্যাসটি সম্পর্কে বলেছিলেন, বইটির পাত্র পাত্রী সবাই কাল্পনিক হলেও, পরিবেশ একান্তভাবে ঐতিহাসিক।

ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কয়েকটি ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা করেছিলেন। "পাষাণের কথা"- তে প্রাক কুষাণ যুগে উত্তরাপথের রাষ্ট্রিক ও সামাজিক জীবনের পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা আছে। "শশাঙ্ক"তে গুপ্তযুগের শেষদিককার ছবি পাওয়া যায়। "করুণা"-তে আছে গুপ্ত সাম্রাজ্যের ধ্বংসের

সূত্রপাতের ছবি আর "ধ্রুব"-তে গুপ্ত সাম্রাজ্যের উদয়ের কাহিনী। "ধর্মপাল" উপন্যাসে পাল সাম্রাজ্যের গৌরবোজ্জ্বল দিনের ছবি পাওয়া যায়। ১৯১৬ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত "ময়ুখ"-এ শাহজাহানের আমলে বাংলায় পোর্তুগীজ অত্যাচারের ছবি পাওয়া যায়। "অসীম"- এ বাদশা ফর্‌রুখশিয়রের আমলে বাংলাদেশের অবস্থার ছবি ফুটে উঠেছে। রাখালদাসের শেষ ঐতিহাসিক উপন্যাস "লুৎফুল্লা"। এতে নাদির শাহের দিল্লী অধিকারের সময়ের ছবি পাওয়া যায়।

অতঃপর আমাদের আলোচ্য ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি দুটি ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা করেছিলেন —"বৌঠাকুরাণীর হাট" (১৮৮৩) এবং "রাজর্ষি" (১৮৮৭)। "বৌ ঠাকুরাণীর হাট" এ রাজা প্রতাপাদিত্যের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। উপন্যাসটির মধ্যে কিছু অনৈতিহাসিক কাহিনীর মিশ্রণ ঘটেছে। যেমন— প্রতাপাদিত্যের কাকা বসন্তরায়কে স্বয়ং প্রতাপাদিত্য কর্তৃক হত্যা প্রসঙ্গ, প্রতাপাদিত্যের পুত্র উদয়াদিত্য ও কন্যা বিভার গল্প ইত্যাদি।

প্রতাপাদিত্যকে নিষ্ঠুর ও নির্মম করে এঁকেছেন ঔপন্যাসিক। প্রতাপাদিত্যের নির্মমতার ফলে কিভাবে তাঁর অন্তঃপুরের শান্তি বিঘ্নিত হল, পুত্র-কন্যার জীবন বিষময় হল, কাকা প্রাণ হারালেন, সদ্যবিবাহিত কন্যা বিভার দাম্পত্যজীবন ব্যর্থ হয়ে গেল- এই সমস্ত ঘটনা নিয়ে উপন্যাসটি রচিত হয়েছে। চরিত্র অঙ্কণে বিশেষ করে প্রতাপাদিত্যের চরিত্র অঙ্কণে ঔপন্যাসিক সত্যিই দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। পরবর্তীকালে উপন্যাসটি অবলম্বন করে রবীন্দ্রনাথ "প্রায়শ্চিত্ত" নাটকটি রচনা করেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরবর্তী ঐতিহাসিক উপন্যাস "রাজর্ষি"। ত্রিপুরার রাজবংশের কাহিনী নিয়ে উপন্যাসটি রচিত। রাজা গোবিন্দমানিক্য, যিনি দেবীমন্দিরে বলিদানের ঘোর বিরোধী ছিলেন তাঁর সঙ্গে মন্দিরের পুরোহিত রঘুপতি-র দ্বন্দ্বের পটভূমিকায় উপন্যাসটি রচিত হয়েছে, যে কাহিনী পুরোপুরি ইতিহাসসম্মত। তবে উপন্যাসটির মধ্যে কিছু ঐতিহাসিক ঘটনা বাদও পড়েছে। যেমন-মোগল সৈন্যর আক্রমণ, শাহসুজার প্রসঙ্গ ইত্যাদি। পরবর্তীকালে এই উপন্যাস অবলম্বনে তিনি বিসর্জন" নাটকটি রচনা করেন।

তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়ও ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা করেছিলেন। "রাধা" (১৯৫৮) তারাশঙ্করের প্রথম ঐতিহাসিক উপন্যাস। মুঘল সাম্রাজ্য যখন পতনোন্মুখ, সেই পটভূমিতে উপন্যাসের নায়কের বৈষ্ণবধর্মের শুদ্ধতা রক্ষার প্রয়াস, পরে রাজনৈতিক সংগ্রামে যোগদান, সংঘর্ষে আহত হয়ে মোহিনীর সেবায় পুনরুজ্জীবিত হয়ে রাধাকৃষ্ণের উপাসনার মহিমা উপলব্ধি উপন্যাসটির মূল বিষয়। "গন্নাবেগম" তারাশঙ্করের অপর ঐতিহাসিক উপন্যাস।

এবারে আসি ঔপন্যাসিক শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঐতিহাসিক উপন্যাসের আলোচনায়। তাঁর প্রথম ঐতিহাসিক উপন্যাস "কালের মন্দিরা"। গুপ্ত বংশের শেষ সমৃদ্ধিশালী রাজা স্কন্দগুপ্তের রাজত্বে হুণ আক্রমণ এবং স্কন্দগুপ্ত কর্তৃক সেই আক্রমণ প্রতিহত করার প্রয়াসই উপন্যাসের মূল অবলম্বন। তবে ইতিহাসের সঙ্গে রোমান্সের মিশ্রণ এখানে লক্ষ্য করা যায়। ভাগ্যান্বেষী যুবক চিত্রকবর্মা এবং রাজকুমারী রট্টা যশোধরার প্রণয় কাহিনীতে ইতিহাসের সঙ্গে রোমান্সের মিশ্রণ ঘটেছে। আবার যুবক স্কন্দ যে একসময় রাজলক্ষ্মীকে বিবাহ করার জন্য তিনরাত্রি মাটিতে শয়ন করেছিলেন—এই ঐতিহাসিক তথ্যটি উপন্যাসে স্থান পেয়েছে। উপন্যাসে হুণ-জাতীর পরিচয়ের মধ্যে ইতিহাসের বাস্তবসম্মত বর্ণনা পাওয়া যায়। তাঁর

পরবর্তী ঐতিহাসিক উপন্যাস "গৌড়মল্লার"। উপন্যাসটির কাহিনী গৌড়াধিপতি শশাঙ্কের মৃত্যুর কিছু পরবর্তী সময়ে থেকে শুরু করে কুড়ি বছর অর্থাৎ সপ্তম শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত বিস্তৃত। বাঙালীর সংস্কৃতি, গ্রাম্যজীবন, নাগরিক জীবন উপন্যাসে স্থান পেয়েছে। রাজা শশাঙ্ক, শীলভদ্র ইত্যাদি চরিত্র ঐতিহাসিক হলেও, উপন্যাসের অন্য চরিত্র শশাঙ্কের পুত্র মানবদেবের চরিত্র অনৈতিহাসিক।

শরদিন্দুর তৃতীয় ঐতিহাসিক উপন্যাস "তুমি সন্ধ্যার মেঘ"। তুর্কী আক্রমণের আগে ভারতের অঙ্গ রাজ্যগুলির পারস্পরিক বিবাদের ছবি আছে এই উপন্যাসটিতে। পালরাজ ও চেদিরাজের মধ্যে বংশানুক্রমিক শত্রুতা, লক্ষ্মীকর্ণ কর্তৃক প্রথমবার গৌড়ে আক্রমণের চেষ্টা, নয়পাল ও লক্ষ্মীকর্ণের মধে সন্ধি স্থাপনে অতীশ দীপঙ্করের ভূমিকা ইত্যাদি ঘটনা ইতিহাস থেকে গৃহীত হয়েছে।

"কুমারসম্ভবের কবি" শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের আর একটি ঐতিহাসিক উপন্যাস। তবে ইতিহাসের সঙ্গে কিংবদন্তীর মিশ্রণ ঘটেছে উপন্যাসে। কুন্তল রাজকন্যা হৈমশ্রীর সঙ্গে কালিদাসের বিয়ে, দেবীর আশীর্বাদে কাব্যজগতে অমর হয়ে থাকা, রাজা বিক্রমাদিত্যের সঙ্গে পরিচয়, মেঘদূত-কুমারসম্ভব রচনা ইত্যাদি ঘটনা অবলম্বনে উপন্যাসটি রচিত হয়েছে।

"তুঙ্গাভদ্রার তীরে' শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। তুঙ্গা ও ভদ্রা নদীর মিলনস্থলে দুশো বছরের জন্য বিজয়নগর রাজ্যের যে সমৃদ্ধি ঘটেছিল, সেই সমৃদ্ধির ইতিহাস নিয়ে উপন্যাসটি রচিত হয়েছে। বিজয়নগরের রাজা দ্বিতীয় দেবরায়, বিদ্যুন্মালা, মণিকঙ্কণা, অর্জুন, কলিঙ্গের রাজবৈদ্য, রসরাজ, লক্ষ্মণ মল্লপ ইত্যাদি চরিত্রগুলি ইতিহাস ও কল্পিত কাহিনী থেকে নেওয়া হয়েছে। যে উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি উপন্যাসটি রচনা করেছিলেন অর্থাৎ বিজয়নগর রাজ্যের সমৃদ্ধির ইতিহাস বর্ণনা, সেই উদ্দেশ্যের দিক থেকে উপন্যাসটি সফল। বাংলা ঐতিহাসিক উপন্যাসের ধারায় শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের "তুঙ্গাভদ্রার তীরে" এক উল্লেখযোগ্য সংযোজন, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

এবার আমরা আলোচনা করব ঔপন্যাসিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়কে নিয়ে। তাঁর প্রায় সব উপন্যাসেই ইতিহাসের কিছু কিছু উপকরণ পাওয়া যায়। মুঘল ইতিহাস, মহারাষ্ট্র রাজপুতদের কথা তাঁর উপন্যাসে স্থান পেয়েছে। তাঁর "সম্রাট ও শ্রেষ্ঠী", "মহানন্দা", "লালমাটি" এই তিনটি উপন্যাসে বরেন্দ্রভুমির ইতিহাস পাওয়া যায়। তবে "পদসঞ্চার" তার শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক উপন্যাস বলা যেতে পারে। ডি-মেলোর বন্দী হওয়া, খোদাবক্স খানের শর্ত ইত্যাদি ইতিহাসের প্রসঙ্গের সঙ্গে হেনরী, স ভাস্কো-ডা-গামা, আলবুকার্ক, গণ্ডুলা, মামুদ ও ফিরোজ শাহ, শ্রীচৈতন্য হুমায়ুন ইত্যাদি চরিত্রগুলিও ঐতিহাসিক। পর্তুগীজদের ভারতের মাটিতে পদার্পণ, ব্যবসা-বাণিজ্যে আধিপত্য লাভের চেষ্টা, উপন্যাসের মধ্যে স্থান পেয়েছে। বাংলার সামাজিক জীবন, অর্থনৈতিক জীবন, আচার-ব্যবহার, সংস্কার ইত্যাদি নানা প্রসঙ্গ উপন্যাসে চিত্রিত হয়েছে।

এছাড়াও একাধিক ঔপন্যাসিক ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা করেছেন এবং আজও করছেন। "বহ্নিকন্যা" উপন্যাসটি গজেন্দ্রকুমার মিত্র সিপাহী বিদ্রোহ অবলম্বন করে লিখেছেন। তাঁতিয়া তোপী, নানাসাহেব প্রভৃতি ঐতিহাসিক চরিত্রের পাশাপাশি নানা অনুমাননির্ভর কাহিনীও উপন্যাসে স্থান পেয়েছে। নেতাজীর বীরত্বপূর্ণ কাহিনী নিয়ে লেখা দেবেশ রায়ের "রক্তরাগ" একটি উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক উপন্যাস। সমরেশ বসুর "উত্তরঙ্গ", স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "চন্দনডাঙার হাট" এই দুটি উপন্যাসে

অতীতে ইংরেজের বাণিজ্য পত্তনের ও শিল্প প্রতিষ্ঠান গঠনের ইতিহাস আছে। সাম্প্রতিককালের দাঙ্গাহাঙ্গামা, দেশভাগের পটভূমিকা নিয়ে অমিয়ভূষণ মজুমদার "গড়শ্রীখণ্ড" উপন্যাসটি রচনা করেন। এইভাবে কখনো প্রত্যক্ষভাবে, কখনোবা পরোক্ষভাবে ইতিহাস উপন্যাসে স্থান পেয়েছে। আজও ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনাধারা অব্যাহত।

৯৪.১০ সারাংশ- ৩

বাংলা উপন্যাসের জয়যাত্রা শুরু হয়েছে ঐতিহাসিক উপন্যাসের হাত ধরে। উপন্যাস রচনার প্রয়োজনীয় উপকরণগুলোকে অক্ষলব্জ রেখে ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে জীবনকে দেখার চেষ্টা করা হয় ঐতিহাসিক উপন্যাসে। ঐতিহাসিক উপন্যাসে ইতিহাস ও মানবজীবনের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করা হয়। এ জাতীয় উপন্যাসে অতীত দিনের কাহিনীকে গ্রহণ করা হয় এবং সেই অতীত জীবন সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য মাথায় রেখে ঔপন্যাসিককে উপন্যাস রচনা করতে হয়।

ঐতিহাসিক উপন্যাস শুদ্ধ ও মিশ্র দুপ্রকারের। শুদ্ধ ঐতিহাসিক উপন্যাস যেমন-বঙ্কিমচন্দ্রের "রাজসিংহ"। আর মিশ্র ঐতিহাসিক উপন্যাস হ'ল রমেশচন্দ্র দত্তের "রাজপুত জীবনসন্ধ্যা"। শুদ্ধ ঐতিহাসিক উপন্যাস আবার দুভাগে বিভক্ত-রাষ্ট্রনৈতিক বিষয় ও সামাজিক বিষয়কেন্দ্রিক। মিশ্র ঐতিহাসিক উপন্যাসও দুভাগে বিভক্ত— ইতিহাসের ছায়ার কাল্পনিক সৃষ্টি ও কাল্পনিক কথামণ্ডিত ঐতিহাসিক উপন্যাস।

ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের "ঐতিহাসিক উপন্যাস" দিয়ে বাংলা ঐতিহাসিক উপন্যাসের সূত্রপাত। উপন্যাসটির দুটি অংশ 'সফল স্বপ্ন' ও 'অঙ্গুরীয় বিনিময়'। তাঁর রচিত অন্য ঐতিহাসিক উপন্যাস হ'ল "স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস"। তবে ঐতিহাসিক উপন্যাস হিসাবে দুটির কোনটিরই তেমন গুরুত্ব নেই।

উপন্যাস রচনার প্রথম যুগে আরো কতকগুলি ঐতিহাসিক উপন্যাস রচিত হয়েছিল। যেমন— "পূর্ণশশী", "অচলবাসিনী", "পাষাণময়ী" ইত্যাদি। এগুলিও তেমন উল্লেখযোগ্য নয়।

ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের হাতে বাংলা ঐতিহাসিক উপন্যাসের যে সুচনা ঘটেছিল পরবর্তীকালে বহু ঔপন্যাসিক সেই পথের পথিক হয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তিনি ঐতিহাসিক উপন্যাসের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক উপন্যাস "রাজসিংহ"। বঙ্কিমচন্দ্রের পরে আরো অনেকেই ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা করেছেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন রমেশচন্দ্র দত্ত, প্রতাপচন্দ্র ঘোষ, স্বর্ণকুমারী দেবী, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ ঔপন্যাসিকবৃন্দ।

৯৪.১১ অনুশীলনী- ৩

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর করুন। উত্তর শেষে উত্তরমালার সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন।

১। ঐতিহাসিক উপন্যাসের সংজ্ঞা দিন ও শ্রেণীবিভাগ করুন।